KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ১১ নং ৩য়েলেস্লী স্ট্রীট, কলকাতা |
| Collection : KLMLGK | Publisher : |
| Title : সত্যযুগ | Size : 7"x10" 17.78x 25.40 c.m. |
| Vol. & Number : ১০/১<br>১১/৯ | Year of Publication : কার্তিক, ১৩৪০<br>কার্তিক, ১৩৪১<br>Condition : Brittle Good |
| Editor : মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন | Remarks : |

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

# সওগাত

## মহিলা-সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৪০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এখন
মূল্য

প্রিয়জনের ফুল্ল মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা কার না হয়?

"রেশমী"-চর্চ্চিত "মীরা তৈল" সুবাসিত আকুল কুন্তলদলের
নিম্নে কজ্জল-উজ্জ্বল নয়ন-পল্লব-ঘেরা,
"মীরা-স্নো" মণ্ডিত, "কুসমিন" সুরভিত "মানসী"
আপনার মানসীর মধুর মুখখানি দেখিতে সাধ হয় কি ?
"মীরা"র প্রসাধন দ্রব্যগুলি সেই জন্যই দেখিতে বলি।

মীরাঃ কলিকাতা।

১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

# সঙ্গীত

## মহিলা-সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৪০

সঙ্গীত কার্য্যালয়,
১১নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন—২৬৮১ কলিঃ

প্রতি সংখ্যা ৷৵০ আনা

## নিবেদন

'হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের রচনা লইয়া ইতিপূর্ব্বে দুইবার 'মহিলা-সংখ্যা' সওগাত বাহির হইয়াছিল। প্রত্যেকবারই সওগাত কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রশংসা ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এরূপ ব্যাপকভাবে হিন্দু ও মুসলমান লেখিকাদের মিলনের প্রচেষ্টা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে কেহই করেন নাই। আজ আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের এবং পরস্পরকে বুঝিবার যে কতটা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

'মহিলা সংখ্যা' সওগাত আমরা বড় আকারে বাহির করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু শারদীয় অবকাশের অল্পদিন পূর্ব্বে কাজে হাত দেওয়ায় আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল; কারণ ছুটীর সময়ে লেখিকাগণের অনেকেই স্থানান্তরে গমন করায় তাঁহাদের রচনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে কয়জনের লেখা পাইয়াছি তাহাই ছাপিয়া এই সংখ্যা বাহির করিলাম। ভবিষ্যতে সুযোগ মত বড় আকারে 'মহিলা-সংখ্যা' বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এবারকার আয়োজনে অপূর্ণতার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বকার মত সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করিবেন।

বিনীত—
সম্পাদক, সওগাত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সওগাত, মহিলা সংখ্যা—কার্ত্তিক, ১৩৪০

বিষয়-সূচী


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১। রিক্ত-সাকী (কবিতা) —বেগম সুফিয়া এন, হোসেন | ১ |
| ২। ইস্লামে নারীর স্থান (প্রবন্ধ) —রাজিয়া খাতুন | ৪ |
| ৩। স্ফুলিঙ্গের স্মৃতি (কবিতা) —কুমারী মলিনা হালদার | ৮ |
| ৪। শিক্ষা (প্রবন্ধ) —মিস্ আছিয়া মজিদ বি, এ | ৯ |
| ৫। নটরাজ (গল্প) —শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী | ১৫ |
| ৬। ঘরকন্নার কথা (প্রবন্ধ) —রাবেয়া খাতুন | ২০ |
| ৭। পাটান হৃদয় (কাহিনী) —মিসেস্ কে, আহমদ | ২২ |
| ৮। অতীতের বাঙ্গালী মহিলা কবি (সচিত্র প্রবন্ধ) | ২৫ |
| ৯। নারীজাতি ও রাজনীতি —শ্রীসরলাবালা সরকার | ৩৩ |
| ১০। ফুলে গেছ হে ধরণী (কবিতা) —শ্রীবিমলা দেবী | ৩৫ |
| ১১। স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান ভারত —কুমারী ছায়া দেবী | ৩৭ |
| ১২। নির্ব্বাসিতা (কবিতা) —শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ | ৪০ |
| ১৩। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি (সচিত্র প্রবন্ধ) | ৪১ |
| ১৪। রাশিয়ার আধুনিক নারী (সচিত্র প্রবন্ধ) | ৪৫ |
| ১৫। শরতের চাঁদ (কবিতা) —মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা | ৪৮ |
| ১৬। ভালোলাগা (গল্প) —শ্রীমতী আশালতা দেবী | ৪৯ |
| ১৭। আশা (কবিতা) —শামসুন নাহার ইউসুফ | ৫৬ |
| ১৮। ব্যথার পরশ (গল্প) —কুমারী জাহান্-আরা বেগম চৌধুরী | ৫৮ |
| ১৯। কিবা গান (কবিতা) —শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী | ৬২ |
| ২০। গালিচার কথা (নিবন্ধ) —শ্রীনীহারবালা দেবী | ৬৪ |
| ২১। দেশ বিদেশের কৃতী মহিলা (চিত্রে) (ক) ভারতবর্ষ (খ) বিদেশ | ৬৫ |
| ২২। বিজয়িনী (গল্প) —বেগম সুফিয়া এন, হোসেন | ৭৩ |
| ২৩। সোণার বরণ আশ্বিনে (কবিতা) —শ্রীসুষমা দেবী | ৮০ |
| ২৪। সমস্যা (প্রবন্ধ) —শ্রীমতী অনুরূপা দেবী | ৮১ |
| ২৫। রিক্তা —শ্রীপ্রতিভা সেন বি, এ | ৮৫ |
| ২৬। মীরার সঙ্গীত (কবিতা) শ্রীমতী রাধারাণী দেবী | ৮৭ |
| ২৭। পরলোকে মিসেস্ এনি বেশান্ত (জীবনী) | ৮৮ |
| ২৮। খেলাধূলায় নারী (চিত্রে) | ৮৯ |
| ২৯। রূপ ও ছবি (চিত্রে) | ৯০ |



## ক্যালেণ্ডার

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের নানাপ্রকার সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার অর্ডারমত প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। এখনই অর্ডার দিলে নিয়মিত সময়ে পাইবেন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বিস্তারের অপূর্ব্ব সুযোগ। মূল্যাদি জানিবার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—সওগাত প্রেস,
১১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

**4 REASONS—WHY ?**

ONE SHOULD INSURE WITH

**THE CALCUTTA INSURANCE Ld.**

*Head Office :—* CALCUTTA.

**Rs. 200,000** DEPOSITED WITH THE GOVT.

1. Permanent disability Features.
2. Revival of lapsed policies any time before completion of their terms.
3. Guaranteed investment policies an unique and unprecedented.
4. Automatic non-forfeiture provisions with other up-to-date privileges.

For Prospectus and District Agency Apply To

The Managing Director.



পাশ্চাত্য জগতের

## নও-মুস্‌লিম এল্‌বাম

ইউরোপ ও আমেরিকার যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য ও মহিমার আকৃষ্ট হইয়া ইহার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাদের পরিচয় ও ছবি উৎকৃষ্ট আর্ট পেপারে পরিস্কাররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ মস্‌জিদসমূহের ছবিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এরূপ ধরণের ইস্‌লামিক এল্‌বামের পরিকল্পনা এই সর্ব্বপ্রথম করা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইহা দেখিয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন এবং অ-মুসলমানগণ ইহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন। ইউরোপের মত সভ্যদেশে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এত অধিক সংখ্যক উচ্চ-শিক্ষিত ইংরাজ মনীষীর স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ ধর্ম্মজগতে বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। সমগ্র জগৎ ভবিষ্যতে যে ইস্‌লামের দিকেই অগ্রসর হইবে, ইহাতে তাহারই পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতেছে। নবদীক্ষিত ইংরাজ মুসলমানদের ছবির এই এল্‌বামখানা আপনার গৃহ লাইব্রেরীর শোভা বর্দ্ধন করিবে এবং সকলেই উহা দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন। আর্ট পেপারে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র। সওগাতের গ্রাহকদের জন্য অর্দ্ধমূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা। অর্ডারে সওগাতের গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে কম মূল্যে পাইবেন না। কজন গ্রাহক একশানার বেশী কনসেশন দরে পাইবেন না।

প্রাপ্তিস্থান—

দি সওগাত লিমিটেড,

১১নং, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯


# সওগাত

১০ম বর্ষ | মহিলা-সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪০ | ১ম সংখ্যা


## রিক্ত সাকী

—বেগম সুফিয়া এন্‌ হোসেন

থেমে গেছে সব গান—থেমে গেছে বীণার ঝঙ্কার
নিভে গেছে উৎসবের দীপ
শূন্য গৃহ আজ অন্ধকার।

মৃত্যুহীন প্রিয়তোর, তুমি হায় হয়েছ অতীত,
সববীণা স্তব্ধ তাই আজি
নাহি আর উৎসবের গীত।

হে গুণি! তোমার স্পর্শে—যে বীণা বাজিত ছন্দে গানে
তানে, লয়ে, মীড়ে মূর্চ্ছনায়
কী আনন্দে উচ্ছ্বসিত প্রাণে,

সেই বীণা আজো আছে—নাই তায় মুগ্ধ গীতি-সুর
ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম হেম-তার
হে মোর সুন্দর,—সুমধুর!

অশ্রুহীন শুষ্ক আঁখি আজি হায় ব্যথাদীপ নিয়া—
সবেদন আকুলতা ভরে
খোঁজে তোমা অনন্তে চাহিয়া!

হে সুন্দর! হে প্রাণেশ! হে আমার ধরণীর আলো
তুমি গেছ কিছু নাই তাই
অন্ধকারে লাগে নাক ভালো।

চাহিবেনা মুখে কেহ, আকাশের অসীমতা নিয়া
ধরিবেনা বুকে;—আর কেহ
কহিবেনা—'ভালোবাসি, প্রিয়া,'।

সহিবেনা অপরাধ—স্নেহের কাজলে ধুয়ে' আঁখি
আর কেহ শুধাবেনা বাণী
শিরপরি, হাত খানি রাখি।

কেন তোমা এত চাওয়া, কোন দ্বন্দে হৃদি উতরোল
জানিবারে নাহি চাহে কেহ
মনে কেন এত ব্যথা দোল?

সাথী মোর! তুমি ছিলে আমার বেদনা-সুখ নিয়া,
লীলাভরে ঝরাইতে সুর
হৃদি-বীণে আঘাত হানিয়া,—

সে আঘাতে ছিল ব্যথা—ছিল নাকো লেশিহান জ্বালা।
ফুলেরে ফোটায়ে কাঁটা নিজে
পড়ে থাকে,— ফুল হয় মালা।

হে প্রেমিক! তুমি তব শ্যাম শান্ত স্নেহাঞ্চল টানি
ঢাকিয়া দিয়াছ কত বার
লাজরক্ত মোর তনুখানি।

কত ব্যথা, কত ঘাত, দিয়েছিনু—প্রতিঘাতে মোরে
রোষে কভু দাওনি লাঞ্ছনা
বাঁচায়েছ জানি বুকে ধরে!

জীবন যাত্রাতে তুমি চলিয়াছ দৃঢ় হাতে ধরি
কঠিন বন্ধুর পথে মোরে,
চালায়েছ মমতা বিথারি।





নাহি আজ তুমি দেব! কে আর দেখাবে মোরে পথ
লও আজি মোরে ডাকি লও
পূর্ণ কর শেষ মনোরথ।

আছে তনু—আছে মন—হয়ত আছে ও রূপরেখা—
তবু কেন আজি ঠেলি পায়
হেলাভরে গেলে চলি একা।

কখনো করনি রোষ—কখনো করনি অনাদর
বেসেছিলে ভালো চিরদিন
সেই গর্ব্বে পরাণ বিভোর।

সে স্বপন টুটে গেছে ভেঙ্গে গেছে সে সুখের খেলা
তুমিও ঠেলেছ আজি পায়
নির্গন্ধ এ পুষ্পে করি হেলা।

আমার সুখের গর্ব্ব স্রষ্টা নিজে পারেনি সহিতে,
তোমারে ডাকিয়া নিলো কাছে
আজি হায় তাই আচম্বিতে!

নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধি খেলাচ্ছলে নিয়াছে উপাড়ি
ফুল হ'তে বৃন্তখানি তার
আর কি সে উঠিবে বিথারি?

ফুটিবেনা ফুলদল, স্তব্ধবীণা গাহিবেনা গান—
গুণীর হাতের স্পর্শখানি
হয়ে গেছে যবে অবসান?

ছড়ায়ে সুবাস স্নিগ্ধ করিবনা তোমার আরতি?
হে দেবতা গিয়াছ চলিয়া'
অক্ষমতা করিছে মিনতি।

বেলা না ফুরাতে প্রিয়, হোল আজি সবই অবসান.
সুরা নাই এযে রিক্ত সাকী!
—তুলে নাও শূন্যপাত্র খান॥

—

# ইসলামে নারীর স্থান

—রাজিয়া খাতুন

ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় অপবাদ আনা হয়েছে এই যে জীবনপথে চলবার পক্ষে নারী পুরুষের সকল সময়ের সঙ্গিণী, এ সত্য ইসলাম মেয়ে নেয়নি। নিরপেক্ষ ইসলাম সমালোচকের চোখে কিন্তু এর উল্টো সত্যই উপলব্ধি হয়। নারীর প্রকৃত মর্য্যাদা ইসলামের মতো অন্য কোন ধর্ম্মমত কোনদিনই স্বীকার করে নি। প্রাচীন রোমে নারী ছিল পুরুষের ক্রীতদাসীর মতো। কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহিত জীবনে স্বামী, স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্র, বা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয় নারীর রক্ষণাবেক্ষণ করতো। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'তে পারতো না, এমনকি, স্ত্রী-ধনের উপর পর্য্যন্ত স্বামীর অধিকার থাকতো। প্রাচীন গ্রীসেও ভামিনীদের অবস্থা ছিল তাদের রোমীয় ভগিণীদের মতো। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মমতও নারীর উপর সুবিচার করেনি। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। ছেলে থাকতে সম্পত্তির উপর মেয়ের দাঁত ফুটাবার উপায় নাই। আবার নারী যদি কখনও সম্পত্তির অধিকারিণীও হয় তবু তাঁহার নিব্‌ঢ় স্বত্ব জন্মে না। অর্থাৎ তার কেবলমাত্র ভোগদখল করবার অধিকার জন্মে, দান-বিক্রয় করার কোনরূপ অধিকার থাকে না। এই সমস্ত ধর্ম্মমতগুলি আবার বহু বিবাহেরও সমর্থন করে। পুরুষ যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারে, আবার খেয়াল মর্জ্জিমাফিক ত্যাগ করতেও পারে। নারীর বেলায় এইরূপ অধিকার ঐ সমস্ত ধর্ম্মমত আদৌ স্বীকার করেনি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরবদেশেও নারীর অবস্থা ছিল ভীষণ শোচনীয়। ধনদৌলতের উপর আরব নারীর কোনই অধিকার ছিল না। পুরুষ ইচ্ছা করলে যত খুশী বিয়ে করতে পারতো, আবার যখন তখন তালাক দেওয়ারও তার অধিকার ছিল। সময় সময় স্বামী স্ত্রীকে সস্‌পেণ্ড করে রাখতো, এ অবস্থায় স্ত্রী বিয়ে করতে পারতো না,—স্বামী কিন্তু অন্য স্ত্রীর সঙ্গসুখ উপভোগে বঞ্চিত হতো না। নারী ছিল আরবদেশে বস্তুপর্য্যায়ভুক্ত। মৃতের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সহিত তাহার পত্নী, উপপত্নী, ক্রীতদাসীদের উপরও উত্তরাধিকারীর মালিকানা স্বত্ব বর্ত্তা'ত। এইরূপে বিমাতারা স্বপত্নী-তনয়ের স্ত্রীতে পরিণত হ'ত। মালিকের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের মাথার উপর একখানি চাদর ঢাকা দিলেই তাদের উপর উত্তরাধিকারীর স্বত্ব জন্মাত। একাধিক উত্তরাধিকারী থাকলে এই সমস্ত নারী তাদের মধ্যে বণ্টিত হ'ত।

ইসলাম নারীকে এইরূপ প্রাণহীন বস্তুরূপে কখনও কল্পনা করেনি। নারী আর পুরুষ যে উভয়ই সমান, নারীত্বে এই ব্যক্তিত্ব ইসলামই প্রথমে স্বীকার করে নিয়ে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য ধর্ম্মমতের সাথে ইসলামের গরমিল ঠিক এইখানে। ইসলাম এ সম্বন্ধে প্রচলিত, অপ্রচলিত বর্ত্তমান ও অতীত সকল ধর্ম্মমতের ঠিক এক ধাপ উঁচুতে অবস্থিত। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে প্রথম নরনারীর যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে তাতে নারীর উপর সব দোষ চাপান হয়েছে। নারী যেন পুরুষকে অধোগামী করবার জন্যই সৃষ্ট, নারীকে এইধরণের অভিশপ্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করা হ'য়েছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ধর্ম্ম কর্ম্মে নারীর প্রবেশ নাস্তির নীতি দিয়ে নারীকে একেবারে নিম্নস্তরে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ইত্যাদির ব্যাপারে নারী বয়কটের বাড়াবাড়িই দেখা যায়। ইসলাম কিন্তু নারীকে বর্জ্জন করবার নীতির কোন দিনই প্রশ্রয় দেয়নি। কোরাণেও মানব সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যে প্রাথমিক নরনারীর উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, পুরুষ নারী উভয়ের কাঁধেই সমান দোষ চাপান হয়েছে এবং প্রার্থনা করা হয়েছে—খোদার





মঙ্গল বারি উভয়ের উপরেই বর্ষিত হয়ে উভয়কে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাক। তা'ছাড়া ইসলাম সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি নারীবর্জ্জন নীতিকে কখনই আমোল দেয়নি। নারীর সহিত সম্পর্কযুক্ত গার্হস্থ্য জীবনই আদর্শরূপে ইসলামীয় ধর্ম্মমতে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং সামাজিকতার ইতিহাসে ইসলামই সর্ব্বপ্রথম নারীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

কোরাণের পাতায় পাতায় এবং ছত্রে ছত্রে নারীর প্রতি সমবেদনাই ফুটে উঠেছে। পূর্ব্বে আরবদেশে স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য পাগল হ'লে বর্ত্তমান স্ত্রীর উপর ব্যাভিচারের অভিযোগ এনে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিত। কোরাণে এর বিরুদ্ধে রীতিমতো আইন জারী করা হয়েছে। কুমারীদের কুৎসাকারীদের উপর এর চেয়েও কড়া আইন জারী করা হয়েছে। স্বামী বা স্ত্রী কেউ কারুর উপর মিথ্যা অপবাদ করলে খোদা তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, কোরাণে এইরূপ মত উল্লেখ রয়েছে।

ইসলামের বিবাহ প্রথাও উন্নততর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। আরবদেশে পূর্ব্বে যে যাকে খুশী বিয়ে করতে পারতো। কোরাণে বিধান করেন :—

"মাতা, কন্যা, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভগিণীকন্যা, স্তন্যদানকারিণী, ও তার কন্যাগণ, স্ত্রীর মাতৃগণ সংমেয়ে, পুত্রবধূ, এবং একসঙ্গে দুই ভগিণীকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

কোরাণে কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমের স্ত্রীকে গ্রহণ করার রীতিও নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে বিধর্ম্মী কুমারী যুদ্ধবন্দিনীকে ইসলামে দীক্ষিত করার পর বিবাহের রীতি সমর্থিত হয়েছে। এই ধরণের কুমারীর যদি কেহ অভিভাবক থাকে তবে তার অনুমতি নিতে হবে। এই কুমারীদের বিয়ে করবার বেলায় রীতিমতো মোহরানার অর্থ ও স্ত্রীর পবিত্র মর্য্যাদা দিতে হবে। কিন্তু জোরে বন্দীকৃত কুমারীদের উপপত্নীরূপে রক্ষা করবার সম্বন্ধে কোরাণ একেবারে বিরুদ্ধ মত প্রচার করেছে। নারীকে ব্যাভিচারের দুরদৃষ্ট, এবং কলঙ্কময় নিপীড়িত জীবন থেকে পত্নীর সিংহাসনে উন্নয়ন ইসলামের নারীপ্রীতির এবং নারী-মঙ্গল বিধানের আর একটী বিজয় কীর্ত্তি।

মাতাপিতা বা অভিভাবকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়ার নিয়ম ইসলাম অবশ্যই মেনে নিয়েছে। পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে পিতা বা বা পিতামহের পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের বিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লে সে বিয়ে সুসিদ্ধ বলে গণ্য হ'তে পারে না। এমন কি পিতা বা পিতামহ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের স্বার্থের ক্ষতিকর বিয়ের ব্যবস্থা করে, কাজীর আদালতে সেই বিয়ে নাকচ করতে পারে। এমন ছেলে বা মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হ'য়ে এ বিয়ে অস্বীকার করেও চলতে পারে। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি প্রকৃত অভিভাবক ছাড়া অন্যের দ্বারা সাধিত বিয়ে বয়স্ক'নের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইচ্ছানুসারে নাকচ হ'তে পারে। এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়ের ক্ষমতা অসীম করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগে বহু বিবাহের খুব বেশী প্রচলন দেখা যেত। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন জাতির মধ্যে বাধাহীন বহুবিবাহের প্রচলন দেখা যায়। ইসলাম অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরব ভূমিতেও যথেচ্ছ যৌন সঙ্গম চলতো। কোরাণে অবশ্য বহুবিবাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইসলাম বহু বিবাহের ব্যবস্থা করেছে দায়ে পড়ে। বহুবিবাহ দস্তুররূপে ইসলাম কখনই মেনে নেয়নি। মুসলমানদের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পুরুষের সংখ্যা কমে যায়। এই সময় নিহত শত্রুদের পরিবারভুক্ত মেয়েরা নিরাশ্রয় হয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের শরণাপন্ন হয়। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধারের জন্য, যাতে ব্যাভিচারের উদ্দাম স্রোতে ইসলাম সেবকদের অধোগামী না করে এই জন্যই কোরাণ বহু বিবাহের সমর্থন করে গিয়েছে। বহু বিবাহ সম্বন্ধে কোরাণ নিম্নলিখিত মত প্রচার করেছে :—

(১) অবস্থাবিশেষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারা যায়। (ওহাদ যুদ্ধের পর বহু বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।)

(২) একসঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা চলবে না। (ইসলাম বহুবিবাহের সীমারেখা নির্দ্দেশ করেছে।)

(৩) সকল স্ত্রীর উপর সমান ব্যবহার করতে হ'বে অন্যথায় বিবাহ করার অধিকার নেই।

বিবাহের পর বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ অর্থাৎ তালাকের কথা এসে পড়ে। কোরাণেও তালাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামীয় তালাকের মূলগত ভাবধারণা কিন্তু একেবারে বিপরীত। নরনারীর মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাই উহার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র উভয়ের মধ্যে মিলন যখন অসম্ভব বিবেচিত হয় তখনই, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নিতান্ত দুর্দ্দৈবের মতো ইসলাম এই কার্য্যকরী নীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছে। সেইজন্য ইসলাম মানুষের কৃত সকল অপরাধের মধ্যে তালাকের স্থান দিয়েছে, সবার নীচে—তালাকের মত জঘন্য কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই।

তালাকের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে ইসলাম কিরূপ সজাগ তা কোরাণ হ'তে উদ্ধৃত কয়েকটী ছুরার নিম্নলিখিতরূপ তাৎপর্য্য হ'তে বেশ বোঝা যাবে :—

(ক) "যদি দুজনের একত্রে বাস করা অসম্ভব বিবেচিত হয়, তা' হ'লে উভয়পক্ষ হ'তে এক একজন বিচারক নিযুক্ত কর। তারা উভয়কে আবার মিলিত করবে।"

(খ) যারা শপথ করে বলে আর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবে না, তাদের চার মাসকাল অপেক্ষা করতে হবে। এই চার মাসের পর আবার যদি তারা স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, তা' হ'লে করুণাময় খোদাতাল্লা তাদের ক্ষমা করবেন।

উপরে যে দু'টো দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো তা থেকে বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, ইসলাম বিবাহ বন্ধন ছেদনের কতটা বিরোধী। ইদ্দতের জন্য যে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে তা কেবল প্রাপ্তবয়স্কা নারীর জন্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কা নারী তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। ইদ্দতের জন্য অপেক্ষার একটা মূল্য আছে, তা হচ্ছে এই যে যে স্বামীর ঔরসে যদি সন্তান হয়ে পড়ে, তবে নিজের ঔরসজাত সন্তানের টানে পুরুষ আবার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

তালাক সম্বন্ধে তৃতীয় নিয়ম হচ্ছে এই যে, মুখ দিয়ে দু'বার তালাক উচ্চারিত হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবার মিলন ঘটতে পারে। অজ্ঞানতার যুগে মানুষ হরদম স্ত্রীকে তালাক দিত আবার তাকে নিয়ে ঘরকন্না করতো। ইসলাম মাত্র দু'বার এরূপ চল্‌তে পারে ব'লে নির্দ্দেশ করে। দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর স্বামীকে হয় চিরদিনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে হবে, আর না হয় তার আশায় চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হবে। কিন্তু এই চরম সময়েও পুরুষের বিশেষ ধৈর্য্যগুণের পরিচয় দেওয়া দরকার। কোন দাম্পত্য জীবন যদি বাস্তবিকই দুঃসহ হয়ে পড়ে, তবে স্বামী, স্ত্রী এবং সমাজ সকলের মঙ্গলের জন্যই সে দাম্পত্য জীবনের অবসান হওয়া ভাল। কিন্তু স্ত্রীকে বিদায় দেওয়ার সময় সদয় ব্যবহারই করতে হবে। তালাক সম্বন্ধে পঞ্চম বিধি, স্ত্রীর মোহরানার পাওনা পরিশোধ। তালাকের পক্ষে এই নিয়মটীর দ্বারা আর একটী বাধার সৃজন করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একমাত্র চরম উপায়রূপেই তালাকের প্রয়োজনীয়তা ইসলাম মেনে নিয়েছে।

তালাক সম্পর্কে ষষ্ঠ রীতি নারীর তালাক দেওয়ার অধিকার। এই রীতি 'খুলা' নামে পরিচিত। দুনিয়ায় অন্য কোন ধর্ম্মেই এই ব্যবস্থা নাই, একমাত্র ইসলামই নারীকে এই অধিকার প্রদান করেছে। মোহরানার দাবী ত্যাগ করে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করতে পারে। সাবিৎবিন কেসের স্ত্রী জমিলা স্বামীকে তালাক দিতে উদ্যত হয় এইজন্য যে স্বামীকে তার পছন্দ হতো না। স্বামী অবশ্য তাকে খুবই ভালবাসতো। জমিলা স্বয়ং হজরৎ মোহম্মদের কাছে এইরূপ স্বীকারোক্তি করে। পয়গম্বর জমিলাকে স্বামী ত্যাগের অধিকার প্রদান করেন। জমিলা মোহরানা বাবদ স্বামীপ্রদত্ত উদ্যানটী আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়। অনেক মুসলিম দেশে এই আইন চল্‌তি আছে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এই আইন এখনও বলবৎ হ'য়ে ওঠেনি।

তালাকের সপ্তম নীতি, বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সমস্যা।





তিনবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীর সাথে মিল্‌তে পারে না। অন্য কারুর সাথে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর বিয়ে এবং আবার বিচ্ছিন্ন না হ'লে আবার পূর্ব্বতন স্বামীর সহিত স্ত্রীর বিয়ে হ'তে পারে না। তালাক প্রদানকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই ইসলাম এরূপ বিধান করেছে। যাতে তালাক নিয়ে কেউ ছেলেখেলা করতে সাহস না করে।

পূর্ব্বোক্ত তালাক অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগের অধিকার এবং খুলা অর্থাৎ স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামী পরিত্যাগ ছাড়া ইসলামী বিধানে আরও তিন প্রকার তালাকের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় প্রকার বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের নাম মুবারত। সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। মুবারৎ নীতি অনুসারে স্বামী-স্ত্রী আপোষ করে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ করে। আর একপ্রকারে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, আদালতের ডিক্রী অনুসারে। বিবাহবন্ধন ছেদ করার পঞ্চম নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে কৃত চুক্তি অনুসারে যে কোন সময়ে স্বামীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারে। স্ত্রীর এই অধিকার তাক্‌উইদ রূপে পরিচিত। নারীর এই অধিকার সামান্য অধিকার নয়।

বিবাহবন্ধন ছেদ করা সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুন নিম্নোক্তরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে :—

(ক) সমাজের হিতসাধনের জন্য ইসলাম বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে।

(খ) ইসলাম স্বামীকে যথেচ্ছ তালাক দিবার অধিকার দেয়নি ; এ ব্যাপারে নানারূপ বাধার সৃজন করেছে।

(গ) ইসলাম কিন্তু বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার বিরোধী।

(ঘ) মানবতার ইতিহাসে ইসলামই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করবার অধিকার দিয়েছে।

(ঙ) মানব-হৃদয়নিহিত দুর্ব্বলতার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বিষময় হতে পারে, ইসলাম অকুণ্ঠিতভাবে এ সত্য উপলব্ধি করেছে। দু'জন মানুষ চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত জীবনযাপন করবে ইসলাম বিবাহ-প্রথার এমন ভাববাদের অবতারণা করেনি। ইসলামের চোখে বিবাহ চুক্তি মাত্র, সুতরাং এই চুক্তির অবসান হ'তে পারে।

ইসলাম বিবাহ ব্যাপারে নারীকে যেমন নানাপ্রকার অধিকার দিয়েছে, সম্পত্তির ওপরও নারীর দাবী সেইরূপ মেনে নিয়েছে। নিম্নে ইসলামী আইনে মেয়েদের সম্পত্তি দখল করবার অধিকারাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল—

(ক) উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে কেহ সম্পত্তি উইল করতে পারে না।

(খ) প্রথমতঃ মৃতের ঋণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ, স্ত্রীর মোহরানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করেনি, তবে পুরুষের চেয়ে তার হিস্যা কম করার কারণ, (১) পুরুষই বেশী উপার্জ্জনক্ষম, (২) বিয়ের পর স্বামীই নারীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করে, সুতরাং তার খরচ অপেক্ষাকৃত কম।

(ঘ) মৃতের স্ত্রী, মা ও কন্যাগণ সকলেই সম্পত্তির হিস্যা পায়। প্রথমতঃ মা আর স্ত্রীর দাবী, তারপর মেয়ের, এবেলার পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন ভেদরেখ টানা হয়নি। মা বাবা ছেলে-মেয়ে না থাকলে বোনরাও সম্পত্তির ভাগ পায়।

উত্তরাধিকারের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম মেয়েদের নানারূপ ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তিগত অধিকারও স্বীকার করেছে। নিম্নে এইসব অধিকারের পরিচয় দেওয়া গেল—

(ক) মা ছেলের ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবং মেয়ের যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রক্ষনাবেক্ষণের এবং অভিভাবকত্বের অধিকারিণী। স্বামী-পরিত্যক্তা হ'লেও নারীর এ অধিকার অব্যাহত থাকে।

(খ) স্বামীর প্রতি যেমন স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে স্ত্রীও সেরূপ স্বামীকে কর্ত্তব্যশীল থাকতে বাধ্য করতে পারে। স্ত্রীকে স্বামীর আত্মীয়স্বজন হ'তে পৃথক্ রাখতে হবে এবং তার প্রকৃত ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করতে হবে।

(গ) মোহরানার জন্য স্বামী স্ত্রীর নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ। এই ঋণদায়ের জন্য স্বামী স্ত্রীকে সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়।

(ঘ) ইদ্দতের সময় স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করতে বাধ্য।

উল্লিখিত ব্যাপারসমূহ হ'তে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইসলাম মোটেই নারীর ওপর অবিচার করেনি। ইসলাম নরনারীর অবাধ সম্মিলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেও পর্দ্দাপ্রথার আমোল দেয়নি। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে জঘন্য পর্দ্দা প্রথা চল্‌তে দেখা যায় তা ইসলামসম্মত নয়। ইসলাম যে আব্রুর ব্যবস্থা করেছে, তা নরনারীর উভয়ের জন্য, তবে মেয়েদের প্রতি সামান্য একটু বেশী আঁটাআঁটির ব্যবস্থা করেছে। সামাজিক জীবনে মুসলিম নারী অতীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। সম্রাজ্ঞী যোবেদা একজন প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। আব্বাস বংশীয় বাদশাহদের আমোলে মুসলিম তরুণীরা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই পর্য্যন্ত করতো, মুক্তাদীরের জননী ছিলেন আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী শেখা শুহ্‌দা বাগদাদে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মুয়াম্বিদ-তনয়া জয়নাব ছিলেন একজন বড়দরের ব্যবহারজীব। উম্মায়িদবংশীয় মহিলাগণও উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য খুব প্রশংসা পান। মুসলিম স্পেনের গ্রানাডা ও কর্ডোভার নাজহাম, জয়নাব, হামদা হাকসা, সুকিয়া, মরিয়ম প্রভৃতি মহিলারা জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে সুপরিচিতা ছিলেন।

ইসলাম নারীকে পদদলিত করেনি, ধূলিবিমলিন, ক্রীতদাসীর পর্য্যায় হ'তে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান পর্য্যায়েই টেনে তুলেছে। নারীর কদর ইসলাম যে কতখানি উপলব্ধি করেছে তা পয়গম্বর মুখনিঃসৃত একটী মহাবচন হ'তে বিশেষ প্রতিভাত হবে,—"বেহেস্ত রয়েছে তোমার মায়ের পায়ের তলায়।"

---

## ক্ষণিকের স্মৃতি

—কুমারী মলিনা হালদার

সেজন চলিয়া গেছে তবু আছে ঘিরে
আজো, তার স্মৃতিখানি মোর মনটিরে ;
সেই স্মৃতিখানি লয়ে
দিন যায় বৃথা বয়ে,
স্মৃতি তার পথে পথে ভুলাইয়া ফিরে।

ক্ষণিকের মোহ তার আবরণ টানি,
আমারে রেখেছে ঢাকি আমি তাহা জানি ;
তাহার যে পদরেখা
হৃদয়েতে আছে লেখা
আজো মুছিল না তাহা নয়নের নীরে॥

---



## শিক্ষা

—মিস্ আছিয়া মজিদ বি, এ

শিক্ষার সহিত জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি এই জন্য জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্খার অনুযায়ী গঠিত হওয়ার প্রয়োজন। আজকাল অবশ্য আমাদের দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে দেশের অর্থ-নৈতিক অভাব-অভিযোগ এবং কৃষ্টিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ার ভিতর দিয়া জাতি চিরদিন গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। ভারতকে যদি মহাজাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে হয় তবে তাহার বীজ বপন করিতে হইবে ঐ স্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়রূপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ—এই তিন স্তরকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থাকে ভারতের কৃষ্টি, ইতিহাস এবং তাহার বিচিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় শক্তির পূর্ণতা সাধন করিয়া ব্যক্তিকে প্রকৃত মানুষ নামের উপযুক্ত করাই শিক্ষার প্রকৃত কার্য্য। বর্ত্তমান বিদ্যাপীঠগুলি কেবল মানসিক উন্নতি বিধানেই নিযুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে স্কুলকলেজের বিদ্যা পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সহায়তা করিতে পারে কিন্তু সংসার পথে যাত্রা করিবার সময় তদ্দ্বারা সামান্য সহায়তাও পাওয়া যায় না। জাতীয় ধ্যান, ধারণা এবং আদর্শ হইতে বিচ্যুত, এই অপূর্ব্ব শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ত্তমানের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে একেবারে অচল। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট পরদেশী ভাষার সাহায্যে বিজাতীয় দৃষ্টি আমাদের উপর আরোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা আমাদের মনঃপুত হইতে পারে না। জাতীয় জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে এই শিক্ষাকে ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় কলাবিদ্যা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বহু গলদ রহিয়াছে। কেবল মাত্র পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের দিকেই এখন বিশেষ লক্ষ্য কিন্তু এতদ্দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। পরীক্ষায় পাশ করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। শিক্ষার উচ্চতর আদর্শও আছে। শিক্ষার্থীর ব্যবসায় বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা বিকাশ, সৌন্দর্য্যবোধ, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত করাই শিক্ষার বৃহত্তর আদর্শ। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই বৃহত্তর আদর্শের কোন সন্ধানই মিলে না। ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া আপন আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার পক্ষে কেতাবী বিদ্যা কোন সহায়তাই করে না। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন ভাবে কর্ম্মনির্ব্বাচনের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বিদ্যালয়ের বাহিরেও যাহাতে ছাত্রদের জীবন বিপথগামী না হয় এমন ব্যবস্থারও প্রয়োজন। স্কুলের সময় অতিবাহিত হইবার পর ছেলেরা আলস্যে কুচিন্তায় কালহরণ করিতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে ক্লাব, নাট্টসমিতি, সমাজ-মঙ্গল সমিতি, পত্রিকা ইত্যাদি স্থাপন করিতে পারিলে শিক্ষার্থীর অবসর সময়টুকু তাহাদের বিকাশ সাধনে ব্যয়িত হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার্থীদের মনে পরার্থপরতা ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়া উঠিতে পারে।

তারপর শিক্ষার বাহনের কথা। পরদেশী ভাষার সাহায্যে বিদ্যার্জ্জন ব্যবস্থার গলদ অনেক। এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না, সময় ও সাহায্য উভয়ের অপচয় হইতে থাকে। বিদেশী ভাষায় শিক্ষার পক্ষে যাহাদের কোন যোগ্যতা নাই তাহাদের শিক্ষার পথে একেবারে কাঁটা পড়িয়া যায়। এরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্রদের কার্য্যে উৎসাহ থাকেনা, তাহারা কাজের মানুষ হয় না, এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান জন্মেনা। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের যুবকদের দুর্গম রটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। পাঠ্যপুস্তকের মতো বিদ্যালয়-জীবনেও শিক্ষার্থীর জীবন এবং চরিত্র গঠনে অনেকখানি সাহায্য করিয়া থাকে। শিক্ষকই বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল। ছাত্রগণ শিক্ষকের আচার ব্যবহার প্রায়ই অনুকরণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ছাত্রদের উপর যেরূপ আদেশ এবং উপদেশের নিগ্রহ চলে তাহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ হইতে পারে না। ছাত্রদিগকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমানের শিক্ষা-বিজ্ঞান এইরূপ আদেশ-নিগ্রহের পরিপন্থী। এই শিক্ষা-বিজ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পাই, শিশুর মন একটী ধাতব পদার্থ নয় যাহা বিদ্যালয়ের মামুলী পাঠ্য-তালিকা অনুযায়ী, শিক্ষকের আপন খেয়াল-খুসী বা মামুলী সিলেবাস অনুসারে গড়িয়া পিটিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এবং এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইলে পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ শিক্ষকদের দ্বারা উহা সম্ভবপর হইবে না। চাই জীবন্ত শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়তল স্পর্শ করিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারিবেন। মোটকথা, শিক্ষার ব্যবস্থা পুঁথিগত না হইয়া ব্যক্তিগত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক এমন শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইবেন যাহা জীবন পথের সন্ধান বলিয়া দেয়—আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। গোড়া হইতেই ছাত্রদের মনের অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে হইবে এবং ইহার ফলে ছাত্রদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি জাগিয়া উঠিবে। ছেলেবেলায় এই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করিবে—জীবনের বড় বড় প্রশ্ন সমাধান করিতে, রাজনীতি, ধর্ম্ম বা নীতিজগতে সে আর অন্ধ অনুকরণকারী থাকিবে না, নিজের পথ নিজেরাই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ আবহাওয়ার সম্পূর্ণরূপে অভাব দেখা যায়। সুতরাং বিদ্যালয়গুলিকে এরূপভাবে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন, যাহাতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষার্থীরা চরিত্রবল, ও মার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া মানুষের মত বাহির হইয়া আসে। নিজের ভাষায় যাহাতে তাহার আপন মনোভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে পারে এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—জীবনের সুখ-সাফল্য উহার উপর অনেক খানি নির্ভর করে।

নিজেকে বুঝিতে পারা, চিনিতে পারার উপরেই জীবনের সাফল্য নির্ভর করে, দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে এই সুবিধা প্রদান করিতে পারে নাই। বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল সাহেব বলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয় না; যার যত বেশী শিক্ষা তাহার মন তত বেশী সঙ্কুচিত হয়। কতকটা যন্ত্রের মত হইয়া পড়ে। এরূপ মন কেবল কতকগুলি বুলি কপ্‌চাইতে পারে মাত্র, ইহার নিকট কোনরূপ স্বাধীন চিন্তার প্রত্যাশা করা যায় না। আমরা নিজস্ব বিদ্যা কিছুই না শিখিয়া ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের মত পরের বিদ্যায় অলঙ্কৃত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়াই ফিরি। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে ভারতীয় জীবন এবং ভারতীয় কৃষির দিকে নিবদ্ধ হয় এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

পরদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা বাস্তবিকই আমাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তার উপর পরদেশী পাঠ্যবিষয়সমূহের সমাবেশ হওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অপক্কপ শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া আমাদের গলদঘর্ম্ম হওয়াই সার হইতেছে, ফল





কিছুই ফলিতেছে না। মনের স্বাভাবিক বিকাশের এবং পরিণতির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ উহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার উৎস যদি এইরূপে শুষ্ক হইয়া যায়, তবে ভারতের অবস্থা প্রাচীন গ্রীক, মিসর বা বাবিলনের অবস্থায় যে উপনীত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় আর্ট এবং ভারতীয় সাহিত্যের দিকেই অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কলেজী শিক্ষায় নোট পড়ার যে ধূম দেখা যায় তাহার আশু তিরোধানের প্রয়োজন। এইরূপ বিদ্যার দোষ এই যে, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার পরেই সমস্ত বিদ্যা একেবারে পানি হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবককে সংসারপথে একেবারে দিশেহারা হইতে হয়। যে শিক্ষা জীবনপথে একেবারে অচল, যাহা অর্জ্জন করিতেও প্রবৃত্তি নাই তাহা লাভ করিবার জন্য সময় এবং অর্থের অপব্যবহার নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় মনের প্রসূতি-আগার স্বরূপ। সেই জন্য জাতির যতকিছু বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক এবং সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধীয় শিক্ষার কোনদিকই যাহাতে উপেক্ষিত না হয় সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভারতের বিশাল কৃষ্টিকে বিকশিত করিতে হইলে ইউরোপীয় কৃষ্টিসমূহের সহিত বৈদিক, পুরাণিক, ইসলামিক এবং বৌদ্ধ কৃষ্টিসমূহও আলোচনা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সভ্যতার যোগসূত্র সমগ্র জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইবে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে বিরোধের ভাব তখন অন্তর্নিহিত হইবার সুযোগ পাইবে। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে যদি কখনও বন্ধুভাব সংস্থাপিত হয় তবে তাহা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়াই সম্ভবপর হইবে।

অর্থনীতির তরফ হইতে বিচার করিলেই দেখা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বহু ব্যয়সাধ্য। যাহাদের শক্তি আছে কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নাই, এরূপ লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারত অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী কিন্তু এই রত্ন আহরণের উপযুক্ত মানুষের দারুণ অভাব। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতের এই সম্পদের উদ্ধার হইবে না। ইউনিভার্সিটিগুলি এ সম্বন্ধে কিছুই করিতেছে না। কেবলমাত্র গণ্ডায় গণ্ডায় গ্র্যাজুয়েট তৈরী করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় খালাস। এই গ্র্যাজুয়েটগণের দৃষ্টি থাকে সরকারী চাকুরীর উপর; আর এছাড়া অন্য কোন কাজ তাহাদের দ্বারা সম্ভবপরও নয়। আজ হাজার হাজার বি-এ পাশ করা যুবক সামান্য অন্নবস্ত্রেরও কাঙ্গাল। উচ্চশ্রেণীর মানুষরা ত তাহাদিগকে ঘৃণা করেই, তাহারা নিজেরাও আপনাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহাদের অসফল জীবনযাত্রার দরুণ পল্লী ও শহরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। নগরগুলি ক্রমশঃ জনবহুল কারাগারের সামিল হইয়া উঠিতেছে যেখানকার বিষাক্ত আবহাওয়া মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করিতেছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় ক্রমে শহরবাসী হওয়ার জন্য পাড়াগাঁ গুলিও শ্মশানের আকার ধারণ করিতেছে।

ভারতীয় কলাবিদ্যা এবং চারুশিল্পগুলিও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থান পায় নাই। সঙ্গীত এবং চারুশিল্প কিন্তু জাতীয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে পরিগণিত। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারত নিজস্ব কলাবিদ্যার অধিকারী, কিন্তু কালের প্রভাবে ইহা বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সঙ্গীত এবং চারুশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু চর্চ্চার অভাবে এই সমস্তের কদর বুঝিবার উপায় নাই। তবে আজকাল গানের বিদ্যালয় স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে বটে কিন্তু কলাবিদ্যা চিত্রশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালয়ের সংখ্যা আরও কম। এই সমস্ত শিক্ষার জন্য আরও নূতন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাহা হইলে লোকে বাস্তবিকই ভারতীয় সঙ্গীত এবং কলাবিদ্যার কদর করিতে শিখিবে।

নাগরিক জীবনের দায়িত্ববোধ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহারা বহির্গত হইয়া আসে

তাহাদের প্রত্যেকেরই দেশ এবং সমাজের অভাব অভিযোগ এবং আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই অভাব পূরণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই অনুকরণপ্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশবাসীর মনে স্বাধীনভাবে নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলিকে এখন হইতেই সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশবাসীকে এমন নাগরিক গুণাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত হইতে হইবে যদ্দ্বারা তাহারা রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারে, প্রকৃত নেতা বা সরকারী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিতে পারে, সংখ্যাধিক্যের নির্দ্দেশ অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে পারে এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যাবলীতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। এই সমস্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা সম্ভবপর নয়; এই জন্য চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সময়ের বাহিরেও উপযুক্তরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

## মেয়েদের শিক্ষা

মেয়েদের শিক্ষা বর্ত্তমানে একটী বিরাট সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পুরুষদের জন্য মোটামোট ধরণের শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও নারীদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক। কেহ কেহ বলেন, নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই; অন্য পক্ষ একেবারে উল্টা গাইয়া চলিতেছেন, নারী পুরুষের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভেদ-রেখা সৃজন করিতেই হইবে। এই উভয় প্রকার মতবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে শিক্ষার অপমানই ঘোষিত হইতেছে মেয়েরা একেবারে পুরুষ বনিয়া গেল, বর্ত্তমান যুগে এরূপ ভাবাপন্ন নারীর প্রয়োজন নাই। মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আরও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিতে হইবে ভবিষ্যতের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনে নারী কোন কোন কাজের উপযুক্তা। এইসঙ্গে নারীর বিশেষ বিশেষ গুণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলি নারীর বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ তাহারা বিশ্বের দরবারে আপন গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে।

মানুষ হিসাবে যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন বালিকাদিগকে সে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও করার প্রয়োজন; রাস্কিন বলিয়াছেন,—"নারী প্রস্তর নয়—যে বাঁটালির সহায়তায় কর্ত্তন করিয়া বা হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়া তাহাকে ইচ্ছানুযায়ী গঠন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফুল যেমন বর্দ্ধিত হয় নারীও তেমনি বিকশিত হইয়া উঠে, অবহেলা কর, শুকাইয়া যাইবে; যত্নকর, বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, প্রশ্রয় দাও বিপথগামী হইবে।" ফুল ফোটাইবার জন্য যেমন গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে হয়, কীটপতঙ্গ এবং বৃষ্টি-বাদলের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, নারীর বেলাতেও ঠিক তেমনি। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য নারীকে চিন্তার স্বাধীনতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবারও যথোপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে।

আমাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় এমন সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা নারীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, অঙ্ক, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণ মেয়েদের পরবর্ত্তী জীবনে কোনো কাজেই আসেনা, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ে মেয়েরা বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই, এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনে স্পষ্ট ভাবে চিন্তা এবং ধারণা করিবার শক্তি জাগরিত হইলেই যথেষ্ট। ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিজের দেশীয় ভাষায় সুন্দর ভাবে লিখিবার এবং বলিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে। ইতিহাস সম্পর্কে বালিকাদিগকে স্বদেশের ইতিহাস পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। শিক্ষা দেওয়ার





সময় খালি বোতল ভর্ত্তি করিবার মত কতকগুলি ভাবধারা এবং বুলি শিক্ষা দিলে চলিবেনা, দেখিতে হইবে, শিক্ষার্থিণী যেন তাহার সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া শিক্ষনীয় বস্তুগুলি গ্রহণ করিতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের দিকে যাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেইদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই জন্য পাঠ্য তালিকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য অঙ্ক এবং ব্যাকরণের বরাদ্দ হ্রাস করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তান পালন, প্রাথমিক সাহায্য প্রদান, রন্ধনতত্ত্ব, সেলাই, চিত্রবিদ্যা, উদ্যান পরিচালন, বেতের কাজ, বয়ন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন।

আমাদের দেশে মেয়েদের আট দশ বৎসর বয়সের সময় হইতে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন মেয়েই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বয়স আরও দুই বৎসর কম হওয়া দরকার। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পাঠ্যতালিকা এবং পাঠ্য বিষয় হ্রাস করিতে হইবে, এবং বিদেশী বাজে বিষয়গুলি একেবারে বাদ দিতে হইবে। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ জন বালিকা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মাত্র অল্পসংখ্যক মেয়ে উচ্চশিক্ষা বা ওকালতী ডাক্তারি প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। সুতরাং মেয়েদের জন্য দুই ধরণের পাঠ্যতালিকার প্রয়োজন। সাধারণ তালিকায় থাকিবে পূর্ব্বোক্তরূপ বিষয় সমূহ, এবং এই সমস্ত বিষয় কেবলমাত্র দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে; তবে সামান্য পরিমাণে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়েরও ব্যবস্থা থাকিবে, আর যাহারা উচ্চশিক্ষার অভিলাষিনী তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বিদ্যাগুলির বরাদ্দ যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি অধিকতর পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে যে সমস্ত মেয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, নারীর অধিকার সম্বন্ধে জনমতও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বহুল পরিমাণে। নারী আর আজ অন্তঃপুরের অচলায়তনে বন্দিনী নয়, আজ বিরাট জগৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত এবং অবারিত। সংসারের শত সহস্র প্রেরণা তাহাকে করুণ আহ্বানে নিতেও করিতেছে পুরুষের পার্শ্বে তাহার নিজের আসন করিয়া লইতে। নারী যাহাতে বিশ্বের বাণী সফল করিয়া তুলিতে পারে বিদ্যালয় সমূহে তদনুরূপ আবহাওয়ার সৃজন করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য যাহাতে তাহারা সঠিক ভাবে সম্পাদন করিতে পারে তাহাদিগকে ঠিক সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ-সংস্কার কার্য্যে নারীর প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য নারীকে গড়িয়া তুলিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকার বাহিরে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া 'গার্ল-গাইড' আন্দোলন সমাজ-সেবাসমিতি, ছাত্রী-সঙ্ঘ, রন্ধন-বিদ্যার শ্রেণী, চিত্র-প্রতিযোগিতা, শুশ্রূষাশিক্ষা-সমিতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বালিকাদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। স্কুল, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শতকরা ৫০ জন বালিকা প্রত্যাবর্ত্তন করে এমন ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া যাহাদের দ্বারা সংসারের কোন কাজই সম্ভবপর নয়। মেয়েদের শারীরিক গঠন এমন ধরণের যে ছেলেদের চেয়ে উহাদের শরীর বৃদ্ধির হার অনেক বেশী, কিন্তু উহা কোমল প্রকৃতির এবং ভঙ্গপ্রবন। সুতরাং যাহাতে তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া না পড়ে এমন গঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পড়াইবার সময়ও এইজন্য ভিন্ন রকমের হওয়া চাই। মোটকথা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতিও যাহাতে ঘটে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

যুগে যুগে নারী সমাজ এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। ভারতভূমিতেও নারী চিরদিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া নাই। ভারতের অতীত ইতিহাস নারীর কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। নারীর কর্ত্তব্য কার্য্য যাহা তাহা নারীকে করিতেই হইবে; এমন কোন শক্তি নাই যাহা নারীকে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। নারী যাহাতে

শীঘ্র শীঘ্র তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে সেইজন্য ব্যাপক শিক্ষা আজ বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়, ঘরসংসারের কাজ আর সন্তান উৎপাদন করাই নারীর একমাত্র কার্য্য নয়, নারীর প্রয়োজন সংসারের প্রতি কার্য্যক্ষেত্রে। রোমারঁলা নারীর সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন,—"নারী বাস্তবিকই একাকী এবং নিঃসঙ্গ। সন্তান ছাড়া আর কেহই তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; কিন্তু এই সন্তানসন্ততি চিরদিন তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা। আত্মার বলে বলীয়ান নারীর সংসারে আরও অনেক করনীয় বিষয় আছে।'

নারী-স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠিবে তখনই যখন নারী তাহার নারীত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিবার অধিকার পাইবে। নারীর এই ব্যক্তিত্ব বিকাশসাধনের দাবী বা অধিকার মাতৃত্ব অপেক্ষাও গরীয়াণ এবং মহত্তর। নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের স্বার্থ-বিরোধী নয়, এবং মায়ের কার্য্যে পুরুষকে সহায়তা করিবার জন্যই উহার প্রয়োজন। নারীর স্বাধীনতা বলিলে ঠিক এইরূপই বুঝিতে হইবে, এবং আমাদের বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান গুলিকে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজন করিতে হইবে যাহাতে নারী তাহার এই বিশেষত্ব বিকাশ করিবার পূর্ণ অবকাশ পায়।

---

"আপনার নাম
মনোহর হর্ম্ম্যরূপ বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক প্রস্তরে রচি, চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা ব্যর্থ মনস্কাম।
প্রস্তর ঘসিছে ভূমে প্রস্তরের পরে,
চারিদিকে ভগ্ন স্তূপ, তাহাদের তলে
লুপ্ত স্মৃতি; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!
মানব হৃদয়-ভূমি করি অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড়ো করিবার;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন,
কালস্রোতধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল!"

—কামিনী রায়



# নটরাজ

—গল্প—

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নটরাজের আড়ম্বর দেখে ও শুনে চোখের অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়েছে, কাণেরও তেমনি। আসলে মনটাই হয়েছে বিরূপ, নটরাজের নাম শুনলেই জলে ওঠে।

আর এই বা কি। পথে ঘাটে, আনাচে কানাচে শোন কেবল "নটোরাজ—হে নটোরাজ—"

নটরাজের চরম দুর্দ্দশা।

বেচারা যদি কখনও জানতে পারতেন, একদিন তাঁর নৃত্যভঙ্গী দেখে—বিশেষ করে এই বাংলাদেশে যুগান্তর আনবে, কি ছেলে কি মেয়ে সবারই দেহে মনে ভাঙ্গন ধরাবে, তা হলে কখ্খনো যে এমন তাণ্ডবনৃত্য করতেন না একথা মর্ম্মর হলফ করে বলে দিতে পারে।

দুনিয়ায় কি আর গান নেই? কেবল "নটোরাজ আর নটোরাজ—"

অনেকদিন ধরে গানটা শুনে আসছে,—"এতদিনে কাণের ভেতর দিয়া মরমে পশেছে গো—"

হৃৎপিণ্ড বড় জোরে চলে,—ওখানেও "নটোরাজের" প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

থিয়েটারে নটোরাজ, বায়স্কোপে গ্রেটা গার্ব্বোর নটোরাজ, নারীনৃত্যে নটোরাজ, ছোট ছেলে-মেয়েগুলো বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচ সুরু করে, সেও সেই নটোরাজ।

নগদ আট আনা খরচ করে একদিন "মাতাহরি" দেখতে গিয়েছিল, যে মুহূর্ত্তে গ্রেটা গার্ব্বোর নাচ সুরু হল, সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের আসন ছেড়ে উঠে গেল। বন্ধু তাপস তার "নটোরাজ"-বিদ্বেষ জানত, সে তাই প্রবোধ দিলে—এরপর চমৎকার একটা নাচ আছে, সে খাঁটি বিলেতি নাচ—

কিন্তু সে-নাচ দেখার অপেক্ষা সে আর করলে না।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বাপ, বদ্ধ জায়গায় অসহ্য গরম, হু হু করে ফ্যান চললেও ঘাম হচ্ছিল রীতিমতই, তার বিরাম ছিল না। নর্ত্তকীর দেহভঙ্গী তাকে মোটেই খুসী করতে পারেনি, ওর পরিশ্রমের ক্লান্তিখানিই সে উপভোগ করেছিল।

চারিদিকেই শোনা যায় গ্রেটার "নটোরাজ" নৃত্যের সুখ্যাতি। কলেজে এর বেশী প্রাদুর্ভাব, শুনে শুনে কাণ পচে যাওয়ার মত।

দু'চার দিন সে আর কলেজে গেল না; কথাটা আগে পুরাণো হয়ে যাক, তারপর যাওয়া যাবে।

বন্ধু সমর এসে বললে, "চল না মর্ম্মর, আজ বিকেলে ভবানীপুরে একটা চমৎকার ব্যাপার আছে। নতুন একটা স্কুল খোলা হবে, তার জন্য টাকা তুলতে কয়েকজন ভদ্রলোক একটা শো-র ব্যবস্থা করেছেন। তোমার তো এ সব ব্যাপারে ঝোঁক বড় বেশী রকম, চল।"

ধীরভাবে মর্ম্মর বললে, "ব্যাপারটা কি হবে?"

সমর বললে, "আমার দাদা এর মধ্যে আছেন তাই আমি শুনেছি। ম্যাজিক গোছের খেলা, রায়-বেঁশে নাচ, গান, বাজনা, এই রকম কি-কি হবে জানি।

রায়বেঁশে নাচ, সে অনেক ভালো।

মন্নদের হুঙ্কার সহ তাণ্ডব লম্ফ অর্থাৎ তারই নাম নাচ,—সে নাচ মর্ম্মর বহুরমপুর থাকতে দেখেছে। নটরাজের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ওর মধ্যে নেই,—আছে লম্ফ-ঝম্ফ,—অর্থাৎ দারুণ বীররস। কা'দের একটা ছেলে রায়বেঁশের চীৎকার আর লম্ফ দেখে ভয় নীল হয়ে অবশেষে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। মর্ম্মর মনশ্চক্ষে রায়বেঁশে নাচটা মনের মধ্যে কল্পনা করে নিলে।

নাচ নাম দেওয়া হলেও সেটা যুদ্ধেরই কসরৎ মাত্র। লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী,—হার্ম্মোনিয়াম তবলা ওর সাথী. কিন্তু রায়বেঁশে নাচ সে সব বাজনার ধারই ধারে না, একটা ঢোল হলেই বেশ হয়।

এ সুন্দর ব্যায়ামটা এদেশ হতে লুপ্ত হতেই তো চলেছিল,—এর নামও অনেকে জানত না। যে ভদ্রলোক এই লুপ্তপ্রায় ব্যায়াম আবিষ্কার করে' সভ্যলোকদের মধ্যে এনে ফেলে সকলকে নাচিয়ে তুলেছেন, মর্ম্মর এই মুহূর্ত্তে তাঁকে স্মরণ করলে।

সমর জিজ্ঞাসা করলে, "কি রকম, যাবে না?"

মর্ম্মর চটপট প্রস্তুত হয়ে নিতে নিতে বললে, "যাব বই কি। রায়বেঁশেদের ওই কসরতটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। চল—বেচারাদের আমাদের মনস্তুষ্টির জন্যে এতটা আয়োজন করার পুরস্কারস্বরূপ গোটা পাঁচেক টাকাও দিয়ে আসা যাবে, কি বল?"

সমর বললে, "সে তোমার খুসি।"

দুই বন্ধু বাসে গিয়ে উঠল।—

বাস হতে নেমে চলতে চলতে মর্ম্মর বললে, "বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী-ভরা সে সব নাচ নেই তো?"

বুঝতে না পেরে সমর তার পানে চাইলে, জিজ্ঞাসা করলে, "কি নাচ?"

মর্ম্মর উত্তর দিলে, "নটরাজের নাচ—।"

সমর হেসে উঠল।

"মাইরি, কি টেস্‌ট তোমার মর্ম্মর, দুনিয়াসুদ্ধ লোক নটরাজের নাচ দেখে অবাক হয়ে যায়, কত ভালোবাসে, কেবল তুমিই ইহার বিরোধী। নটরাজের মূর্ত্তিটাই চমৎকার। লোকে নিজেরা অনুকরণ করে, ছবিতে আঁকে, মাটীতে গড়ে, মুখে তার বর্ণনা করে, তবু তাকে যেন ফুটাতে পারে না, তবু যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সেই নটরাজ প্রাণে গিয়ে পৌছাতে পারলে না, বাইরেই রয়ে গেল?"

মর্ম্মর বিরক্ত মুখে বললে, "প্রাণে গিয়ে খুব পৌচেছে ভাই, উপছে উঠছে,—ওর আর জায়গা হচ্ছে না। তোমাদের নটরাজ তোমাদেরই থাক, তোমরাই জন্ম জন্ম ওর অনুকরণ কর, আমার পক্ষে দরকার নেই। হাত পায়ের আঙ্গুলের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি আমার মোটেই ভালো লাগে না। গানটা শুনে কাণ একেবারে পচে গেছে।"

সমর রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঘুষি লড়ে আর কি; আস্তিন গুটিয়ে সে বললে, অমন কথা বলো না মর্ম্মর, নটরাজের গান আজ আমাদের কাছে ইউনিভার্সাল হয়ে গেছে, যে না জানে তাকে আমরা বয়কট পর্য্যন্ত করতে রাজি। অমন গান তুমি আর একটা দেখাও দেখি—। উঃ, ওই দুটো লাইনের ব্যাখ্যা কর তো—"

'বলতে বলতে সে গুণ গুণ করে সুর ধরলে—

রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।—'

গান থামিয়েই সে আবার তাল ঠুকে বললে, "নাও, ব্যাখ্যা কর দেখি।"

হাত জোড় করে মর্ম্মর বললে, "রক্ষে কর, আমি ওসব ব্যাখ্যার দিকে নই। আসলে আমার ভালো লাগে না, তোমরা জোর করে তবু ভালো লাগাতে চাও না কি—আশ্চর্য্য!"





সমর বললে, "তবু ভালো না লাগার একটা কারণ কিছু থাকবে তো।"

মর্ম্মর খানিকটা ভাবলে, বললে, "কারণ অবশ্য খুঁজে পাইনি, ভালো লাগেনি, স্পষ্ট কথা—এর মধ্যে আর কারণ কি থাকতে পারে?"

সমর আর কথা না বলে অগ্রসর হল।

বেচারা মর্ম্মরের জন্য সমরের দুঃখও হতো। এমন হতভাগা—নটরাজের নাম পর্য্যন্ত সইতে পারে না, একেবারে ক্ষেপে উঠে' মারতে আসে।

রায়বেঁশে নাচ হয়ে গেল,—

তার পরই ষ্টেজে দাঁড়াল একটী ছোট মেয়ে।

সেই গান—'নটোরাজ—হে নটোরাজ', আর সেই অষ্টাবক্র নৃত্য—

মর্ম্মর ক্রুদ্ধনেত্রে বন্ধুর পানে চাইলে।

সমর তার হাতখানা চেপে ধরলে, বললে, "রোস, অতটা অস্থির হয়ো না। মিস্ মণিকা সেনের নাচ না-দেখে এমন লোকই নেই। অতটুকু মেয়ে, নটরাজ নাচ দেখিয়ে এত মেডেল পেয়েছে—"

বাধা দিয়ে মর্ম্মর বললে, "মাপ কর, মেডেল আর আমি দেখতে চাইনে। আমি চললুম—"

ঝড়ের মতই সে বার হয়ে গেল। ওপাশ হতে বন্ধু দীনেশ চাপাসুরে বলে উঠল, "Porty-nine."

অর্থাৎ কিনা মর্ম্মর উনপঞ্চাশ বায়ুগ্রস্ত—সোজা কথায়, পাগল—।

মর্ম্মর জলন্ত দৃষ্টিতে তার পানে একবার চাইলে। চোখে যদি দাহিকাশক্তি থাকত দীনেশ পুড়ে মরত তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই

সামনেই গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল—তাই রক্ষা, নচেৎ মর্ম্মরকে আর বাঁচতে হতো না।

কলেজের মধ্যে এর মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল মর্ম্মর নটরাজের ঘোর বিদ্বেষী, নটরাজের নাম করলে সে জ্ব'লে ওঠে, নটরাজ গান শোনা বা নাচ দেখা দূরের কথা।

যে সব মেয়েরা কলেজে পড়তেন, তাঁরা অনুকম্পার দৃষ্টিতে এই হতভাগা ছেলেটীর পানে চাইলেন। তাঁদের মুখে যে-হাসির রেখা ফুটে উঠল তাতে প্রকাশ হল অজস্র করুণা —

বেচারা মর্ম্মর নটরাজকে চিনতে পারলে না। যে নটরাজ নৃত্যে গ্রেটা গার্ব্বো এত সুখ্যাতি পেয়েছে, উদয়শঙ্কর দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন, বেচারা মর্ম্মর, এমন নটরাজকে চিনতে পারলে না।

যেখানেই সে যায় এই সন্ধানানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি তার পরে পড়ে, আশপাশে উনপঞ্চাশ বায়ুর আধিপত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলে।

প্রথমটা মর্ম্মর সেদিকে দৃষ্টিপাত না করলেও ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

ঠিক এই সময়েই এসে পড়ল গ্রীষ্মের দীর্ঘাবকাশ, মর্ম্মর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, এই দীর্ঘকালে তার অদর্শনে এ কথাটা সকলেই ভু'লে যাবে,—এর খবর আর এ সব কথা কেউই তুলবে না।

মা বললেন—"বিয়ের পাত্রী ঠিক করেছি মর্ম্মর বিয়েটা ক'রে ফেল, এবার আর কোনও আপত্তি শুনছিনে।"

মর্ম্মরের ও আপত্তি করার হেতু ছিল না। একদিন সে মায়ের কথায় আপত্তি করেছিল, সে আজ তিন বছর আগেকার কথা। আশ্চর্য্য—মা তারপর এই তিন বছরের মধ্যে আর একটীবার বিয়ের কথা তোলেন নি।

মর্ম্মর মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মা তা জানতে পারেন নি। ছেলে যে বিয়ে করতে চায় নি এতে তিনি সত্যই ভারী খুশি হয়ে উঠেছিলেন এবং সাহঙ্কারে এ কথা সকলের কাছে বিবৃত করেছিলেন।

আজ মায়ের কথা শু'নে তার আনন্দ হয়েছিল বড় কম নয়।

মা তাকে নীরবে থাকতে দেখে বললেন, "যদিও আমি পাত্রী ঠিক করেছি, তাও তুই একবার নিজের চোখে দেখে আসিস্ বাপু। আমি তো চিরকাল বেঁচে বউ নিয়ে ঘর করব না, ঘর করবি তুই-ই, কাজেই তোকেই দেখে শুনে পছন্দ করে নিতে হবে।"

কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মর্ম্মর বললে, "দরকারই বা কি মা,—তুমিই তো দেখেছ।"

মা বললেন, "দেখলেই বা, তবু তোর দেখা চাই তো বাপু। শুনেছি মেয়েটী চমৎকার দেখতে, আর গান যা গায় সে আর বলবার কথা নয়। গলার সুর তো নয়—বাঁশী, সবাই হাজার মুখে তার গানের সুখ্যাতি করে। তুই শুনেছিস বোধ হয় তোর বন্ধুদের মুখে—"

মর্ম্মর গানটাকে একদিন খুবই পছন্দ করত, আজও সে করে না তা নয়—তবু ওই "নটোরাজ" তাকে কেন গানের পরে দারুণ বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে।

সে মায়ের কথার উত্তরে কেবল মাথা নাড়লে, বললে, "না' আমি তার কথা শুনি নি।"

মা বললেন, "যাই হোক, তুই কবে যাবি সেই দিনটা আমায় জানিয়ে দে, আমি তাদের একটা খবর দেই। হাজার হোক—গেরস্ত ঘর তো, আগে হতে উদ্যোগ ক'রে রাখবে।"

মর্ম্মর খানিক ভেবে বললে, "বন্ধুদের খবর দেই তারা আসুক, তারপর তোমায় ঠিক করে জানাব।"

পরম বন্ধু সমরের কথা একবার মনে হল, কিন্তু তাকে সে খবর দিলে না। সমর তাকে একদিন-যে সকলের সামনে অপদস্থ করেছে সে কথা তার মনে আছে।

আর দুই একটি বন্ধুকে সে জানালে—সম্প্রতি তার বিয়ে লাগছে, তাদের আসতে হবে, উপস্থিত, পাত্রী দেখা কাজটা তাদেরই।

হতভাগা সমরটাকে নিমন্ত্রণ না করলেও স্রোতের মুখে শেওলার মত ভেসে সে এসে পড়ল।

যহানন্দে মর্ম্মরের হাতখানা ধরে সে বলে উঠল,—"আরে এ কথা আমাকে আগে জানাতে হয়। তোর বিয়েতে বর-যাত্রী যাব, নেমন্তন্ন খাব, নাচব, গাইব, আর তুই কিনা আমায় একটা খবর দিস নি। চল—মেয়ে দেখে একেবারে আশী-র্ব্বাদ পর্য্যন্ত করে আসব, কি বলিস?"

মর্ম্মর বললে, "আশীর্ব্বাদ আমরা করব কেন, মা করবেন।"

সমর বললে, "বেচারা মাকে আর এর মধ্যে টানাটানি কেন, আমিই তোর অভিভাবক স্বরূপ আশীর্ব্বাদটা সেরে আসব এখন সে জন্যে কুচ্ পরোয়া নেই। বিয়ে আজও করি নি বটে, অনেকের বিয়ে দিয়ে এসেছি তা জানিস তো।"

মর্ম্মরের মা হাসলেন, বললেন, "একটা বিয়ে কর বাবা, নিজে বিয়ে করলে জানতে পারবে—আশীর্ব্বাদ জিনিসটা কি, আর কাদেরই বা করতে হয়।

ভাবি-শ্বশুরবাড়ী অভ্যর্থনা যথেষ্টই লাভ হল।

পাত্রীকে যখন আনা হল, মর্ম্মর একবার বাঁকা চোখে দেখে নিলে।

না, খুব সুন্দরী না হলেও সুন্দরী বলা চলে। গায়ের রংটা একটু ময়লা, তাতে আর কি হল,—মুখ, চোখ, চুল সবই চমৎকার।

হাজিল সমর চুপে চুপে বললে, ভালো করে দেখে নাও হে, ভবিষ্যতে তোমাকেই ঘর করতে হবে। আমরা মাঝে মাঝে দু একপেলা চা, দুই একখানা শিঙাড়া, কচুরী, পেলেই ধন্য হয়ে যাব?"

ললিত গম্ভীর মুখে বললে, "আর পান?"

সে পানটাই ভালোবাসত বেশী।

পাত্রীর সম্পর্কীয় দাদাবাবু বললেন, "সে সব আপনাদের ভাবতে হবে না মশাই, অরু আমাদের সব কাজ করতে পারে! রান্না, পান সাজা হতে আরম্ভ করে নাচ গান পর্য্যন্ত, শিক্ষা করতে ওর কিছু বাদ নেই।"

সুধীর বললে, "গান একটা নিশ্চয়ই শুনতে পাব।"

দাদাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই—"

তাঁর কথায় কিশোরীটি হার্ম্মোনিয়াম নিয়ে বসল।





সেই সুরই বাজে যে,—

মর্ম্মরের পানে তাকিয়ে বন্ধুদের মুখ চাপা-হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠল।

মর্ম্মর উসখুস করছিল—বিরক্তিতে তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

পাত্রী গান ধরলে—সেই "নটোরাজ হে নটোরাজ—"

নিকুচি করেছে নটোরাজের--

সমর আর হাসি চাপতে পারে না।

বেচারী মর্ম্মর,—নটোরাজ ওকে যেন অনুসরণ ক'রে চলেছে।

নিতান্ত আচমকা ভাবেই সে ঘর হতে বাইরে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও উঠে দাঁড়াল।

দাদাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "উঠলেন যে?"

নিতান্ত অপ্রতিভের মত মুখখানা ক'রে হাত দুখানি কচলাতে কচলাতে নিরীহ ভাবে সমর বললে "কি করব মশাই, ওই "নটোরাজকে" এড়াতে চাই আপনাদের হবু-জামাই "নটোরাজ" শুনলে ক্ষেপে যায়। ওর ওই ছিটটাই নচেৎ অমন ভালো ছেলে আর দুটি নেই। আমাদের অন্যায় হয়েছিল, আগেই যদি আপনাদের একবার জানিয়ে দিতুম—এ কাণ্ডটা হতো না। মাপ করবেন আমাদের।

তারা বা'র হয়ে গেল।

পাত্রী তখন একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল রে?"

মর্ম্মর বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বললে, "আমি বিয়ে করব না।"

মা আকাশ হ'তে পড়লেন-- "কেন?"

মর্ম্মর কথা বলে না।

কোলাহলের সঙ্গে বন্ধুরা এসে পড়ল, তাদের মুখে মা সব শুনে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন।

এরই দু-তিনদিন পরে পাত্রীর পিতার এক পত্র এসে হাজির।

তিনি জানিয়েছেন—

বিশ্বস্তসূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন পাত্রের মাথার কিছু গোলমাল আছে। তিনি নিজের বাড়ীতেও এটা লক্ষ্য করেছেন—তাঁর মেয়ে যে মুহূর্ত্তে নটরাজের গান ধরেছিল, ছেলেটী সেই মুহূর্ত্তেই চলে গেছে। তিনি এমন বিকৃত-মস্তিস্কের হাতে মেয়ে দিতে পারবেন না, এ জন্যে পাত্রের মা যেন কিছু না মনে করেন।

মর্ম্মর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

মেয়েটী বেশই ছিল, কিন্তু সব-মাটি করলে ওই "নটোরাজ।"

নিদারুণ রাগে মর্ম্মর কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

# ঘরকন্নার কথা

—রাবেয়াখাতুন—বগুড়া

## —মা-বাপ ও ছেলে-মেয়ে

আমাদের পারিবারিক জীবনে এমন একদিন ছিল, যখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মা ও বাপকে খুবই সমীহ করিয়া চলিত—তাঁহাদিগকে পীর-পয়গম্বরের মত ভয় ও ভক্তি করিত।

সুখের বিষয় আজকাল পারিবারিক জীবনের সেই পুরাতন ধারাগুলি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইতেছে—আজিকার মাতা-পিতারা পীর-পয়গম্বরের আসন ছাড়িয়া বন্ধুরূপে ছেলে-মেয়েদের নিকটে আসিতেছেন। আমার পরিচিত কয়েকটি পরিবারের ভিতরে এই নূতন আবহাওয়া দেখিতে পাইতেছি। ইহা খুব আশা ও আনন্দের কথা।

## —ছেলেদের প্রশ্ন—

সেদিন এক সখীর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে দেখা—দুইজনে মগ্ন হইয়া গল্প করিতেছি—এমন সময় ওদের সাত-আট বছরের খোকা কি যেন প্রশ্ন করিয়া বসিল। খোকার মা এ বেয়াদপী সহ্য করিতে পারিল না—খুব জোরে একটা ধমক দিয়া উঠিল। বেচারা খোকা মলিন মুখে সরিয়া গেল।

এ ঘটনার পর সেদিন আর আমাদের গল্প ভাল জমিল না।

আমার মনে হয় ছোট ছেলে-মেয়েরা আমাদের কথা-বার্ত্তার সময় যোগদান করিলে তাহাদিগকে ধমক দিয়া চুপ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। উহাদিগকে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার অবসর দেওয়া উচিত—নতুবা উহারা মনে বড়ই আঘাত পায়।

অবশ্য, একজন কথা বলিতেছে—শেষ করে নাই—এমন কথার মাঝখানে কথা বলা শুধু ছেলের কেন বুড়োদের পক্ষেও বেয়াদপী। ছোট ছেলেমেয়েদের এ কথাটী খুব স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত।

একটু বড় হইলে ছেলে মেয়েরা বড়ই অভিমানী হয়। এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের লইয়া একটু সাবধানে চলা উচিত। খোকা হয়ত খুব গম্ভীর হইয়া তাহার মাতাকে একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল—ইহাতে মা যদি খোকার গম্ভীর মুখ দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, বা দা'-তা' বলিয়া প্রশ্নটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে—তাহা হইলে ছেলে বেকুব বনিয়া যায়—আর কখনো মায়ের নিকটে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না।

মা-বাপেরা ইচ্ছা করিয়া ছেলে-মেয়েদের সহিত এমন ব্যবহার করিলে উহারা আপনাদিগকে বড়ই অসহায় ও ছোট মনে করিতে শিখে—ইহা ছেলে-মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের আদৌ অনুকূল নহে।

ঠাট্টা তামাসা করিয়া কখনো কোনো ছেলে-মেয়েকে সংশোধন করা যায় না—ইহা বাবা ও মায়ের মনে রাখা উচিত।

## —ছেলেদের শাস্তি দেওয়া—

ছেলে-মেয়েদিগকে 'মারধর'-করা সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। আমি ওদের কায়িক শাস্তি দেওয়া আদৌ পছন্দ করি না। ইহাতে ছেলে-মেয়েরা 'বয়ে' যায় ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শুধু 'মারধর' কেন, মারধরের ভয় দেখানোকেও আমি অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

অনেক সময় গৃহকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে গিন্নী দুষ্ট ছেলে-





টীকে নিজে না মারিয়া ভয় দেখাইয়া থাকেন—"আচ্ছা, দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি—তোর বাবা এলে ব'লে দিয়ে এমন মার খাওয়াব যে সাত জন্মেও ভুলতে পার্ব্বিনে—"

তখন হয়ত বেলা একটা—কর্ত্তা রাত্রি সাতটার আগে বাসায় ফিরিবেন না - এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া হতভাগ্য দুষ্ট ছেলেটা বাবার মারের ভয়ে মুখ চুন করিয়া থাকে ও মনে মনে জীবণ 'অশোয়াস্তি' ভোগ করে। খেলাধূলা—দৌড়া-দৌড়ি তাহার কিছুই আর ভাল লাগে না।

মিছামিছি ছেলে-মেয়েদের মনে এই কষ্ট দেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করি না। সারা দিনের পর বাবাকে আপিশ হইতে ফিরিতে দেখিলে ছেলে-মেয়েদের মন যেন খুশীতে ভরপুর হইয়া উঠে—ভয়ে জড়সড় হইয়া না পড়ে, এদিকে মায়েদের নজর থাকা উচিত।

## —ছেলেদের দ্বারা কাজ—

মাতা-পিতা যাহা করেন ছেলে-মেয়েরা তাহা করিতে ভালবাসে। মা-বাপের এতটুকু কাজ করিতে পারিলে উহারা খুব খুশী হয়—ভাবে, আমরাও কাজের লোক হইয়া উঠিয়াছি। মনে এই ভাব আসা ছেলে-মেয়েদের কায়িক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল।

## —জিনিষ গোছাইয়া রাখা—

ছোট ছেলে-মেয়েদের বাড়ীতে জিনিষ পত্রের নড়চড় না হইয়া পারে না। এখানকার জিনিষ ওখানে রাখিতে পারিলে দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের আর খুশীর অন্ত থাকে না। অথচ উহা-যে মা-বাপের পক্ষে কত অসুবিধাজনক তাহা উহাদের মনেই আসে না। মা-বাপ এজন্য সর্ব্বদা হুসিয়ার না থাকিলে ঘর-বাড়ী শ্রীহীন হইয়া পড়িবে।

## —ছেলে-মেয়েদের সাম্‌নে ঝগড়া—

সংসার করিতে গেলে অনেক সময় কর্ত্তা ও গিন্নির মধ্যে মতভেদ হইয়া থাকে। একটু অসাবধানতায় এই মতভেদ মাঝে মাঝে ঝগড়াতেও পরিণত হয়। আপন ছেলেমেয়েদের সামনে কর্ত্তা-গিন্নিতে ঝগড়া লাগা পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় অমঙ্গলজনক কাজ। ঝগড়াটে মা-বাপকে কোনো ছেলেমেয়েই ভাল বাসিতে বা শ্রদ্ধা করিতে পারে না। মুখ ফুটিয়া না বলিতে পারিলেও উহারা ছেলেবেলা হইতেই বদ্‌মেজাজী মা-বাপকে ঘৃণা করিতে শিখে।

সুতরাং কর্ত্তা-গিন্নির মতভেদটা একটু নিরিবিলিতে আপোষে মিটাইয়া লওয়াই ভালো। চতুর গৃহিনীরা ছেলেমেয়েদের সামনে কর্ত্তার বকুনি খাইয়াও নীরবে হজম করেন ও সময় মতে সুদে আসলে আদায় করিয়া থাকেন!

সংসার-তরণী এতই ভঙ্গপ্রধান যে এতটুকু অসাবধানতায় উহা কখন বান্‌চাল হইয়া যাইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। সুতরাং কর্ত্তা-গিন্নীকে সর্ব্বদা হুসিয়ার থাকিতে হইবে।

## —পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা—

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের পরিস্কার রাখা যে কতবড় কঠিন কাজ তাহা মা ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। উহারা গায়ে ধূলামাটি মাখিতে—ভাল জামাটা নোংরা করিতে বড়ই ভালবাসে। সুতরাং মা যদি একটু 'আল্‌সে' প্রকৃতির হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে পারে। ছেলের মা 'আল্‌সে' হইলে কিছুতেই চলিতে পারে না।

সারাদিন কাজকর্ম্মের পর, পরিশ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া নোংরা ছেলে-মেয়ে ও শ্রীহীন গৃহিণীকে দেখিলে কর্ত্তার মন নিশ্চয়ই পুলকিত হইয়া উঠে না। সে সময় ছেলে মেয়েদের উপর সমস্ত দোষ চাপাইলেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুতরাং একটু 'গা' করিয়া বেলা থাকিতে ঘর-বাড়ী, বিছানাপত্র, ছেলে-মেয়ে এমন কি নিজের দেহটিও পরিস্কার করিয়া না রাখিলে গৃহ-কর্ত্তার মুখভার সহ্য করিতে হয়।

আমি ছেলের মাদিগকে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে বলি। আজকাল নানাকারণে স্কুল-কলেজে-পড়া গৃহস্বামীদের

মন জোগান কঠিন হইয়া উঠিতেছে, ইহার উপর নিজেদের অসাবধানতায় যদি গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে তাহা হইলে বড়ই আফশোশের কথা।

গৃহের যিনি লক্ষ্মী তাঁহাকে যে কতদিকে তাল সামলাইতে হয়—তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি স্বামীর স্ত্রী, পুত্র-কন্যার মা চাকর-চাকরাণীর কর্ত্রী, অতিথি-মুসাফিরের অন্নদাত্রী—একাধারে এতরূপ আর কাহারো দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

# স্পার্টান-হৃদয়

—মিসেস্ কে, আহমদ—

স্পার্টার নারী-হৃদয় বড়ো শক্ত, পাষানে-গড়া—তা ভাঙেও না, নুয়েও পড়ে না। স্পার্টার নারী যুদ্ধের সময়ে স্বামী ও সন্তানকে বিদায় করত এই ব'ল, 'হয় বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে, নতুবা সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করবে।' এতেই বোঝা যাচ্ছে কী তাদের মন! পরাজিতের প্রতি তাদের কোনো দয়ামায়া ছিলো না, এমন কি তাকে মনে-করাও নিতান্ত অগৌরবের বিষয় মনে করত। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করাটাকে তারা ব্যক্তিক ক্ষতি বলে জানত না, বরং একটা বৃহত্তর কল্যাণ বলে ভাবত। যে-ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রুর সঙ্গে যুঝতে কুণ্ঠিত হতো তার প্রতি নারীর কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না, অশ্রদ্ধা ছিলো প্রচুর। কারণ, তার কর্ত্তব্য শত্রুর পড়গতলে আত্মবলিদান, কাপুরুষের মতন শত্রুকে পিঠ-প্রদর্শন নয়।

খৃঃ পূঃ ৩৭১ অব্দে ল্যুক্টার যুদ্ধ হয়েছিল। শোনা গেল গ্রীকদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে প্রায় তিনশতাধিক সৈন্য ফিরে আসছে, বহুসংখ্যক শত্রুর হস্তে নিপাত হল। সমস্ত স্পার্টাবাসীর মন বিরক্তিতে ও বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। পরাজয়ের জন্য কারো দুঃখ ছিলো না, কিন্তু যারা যুদ্ধ-পালিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে ফিরে আসছে তাদের কর্ত্তব্যহীনতা সকলের মনকে নিপীড়িত করে তুল্‌ল। উৎসব-সভায় পৌছেছিল এ পরাজয়ের সংবাদ; এবং এফোর্‌সের হুকুমে উপস্থিত প্রিয়-পরিজনদের মধ্যে নিহতদের খবর ঘোষণা করা হল।

কিন্তু এ দুঃসহ সংবাদে নারীকে কেহ শোকাশ্রু বিসর্জ্জনের অধিকার দিলে না। ইউক্রেটিস্ নামে একজন সৈন্যের মাতা প্রথমে পুত্রশোকে অধীরা হয়ে পড়েছিলো—হাজার হোক মাতৃহৃদয় তো; কিন্তু সেজন্য তাকে কেহ ক্ষমাও করলো না। প্রতিবেশিনীরা আপত্তি করলো, 'ইউক্রেটিসের মাতা কাঁদচে কেন? তার সন্তান যদি যুদ্ধে পিঠ-প্রদর্শন করে ফিরে আসত তবেই তো তার কাঁদবার অধিকার থাকত।

ফিডন নামে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে দেখতে এল। এসে দেখল তার সমস্ত কাজকর্ম্ম নিয়ে সে ব্যস্ত অথচ দু'চোখ ফেটে অশ্রু ঝরছিল অবিরাম। এ লোকটি ছিলো অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, তার ধমনীতে সত্যকার স্পার্টানের রক্তই প্রবাহিত হতো। রুক্ষ মেজাজ করে ইউক্রেটিসের জননীকে বলল "ঝাখো! ইওন, তোমার আঁখিদ্বয় হতে একবিন্দুও অশ্রু ঝরে-পড়া অন্যায়, ভারী অন্যায়। কাঁদবার একটা অধিকার থাকা চাই, সে তোমার নেই। হয়ত ও' কাঁদন আমাকেই সাজে। কারণ, যে-ক্ষেত্রে তোমার সন্তান





দুঃখ সয়ে' বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমার দৌহিত্র অত্যন্ত হীনভাবে আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে। একদা এরই পিতা নিজের অসম সাহসিকতা দিয়ে আমার মুখোজ্জ্বল করেছিল, কিন্তু সে-পিতার সন্তান আজ আমার কুলকলঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। আজ তার দিকে মুখ তুলে' চাইতেও আমার লজ্জার অবধি নেই। সত্যি ইওন, কেলেইসের পিতা আমার জন্য যে গৌরব-মুকুট তৈরি করেছিল, আর যা' রেখেছিলাম সসম্মানে আমার মাথায় তুলে' তাকেই ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে পায়ের নীচে মাড়িয়ে দিলে কেলেইস নিজে। হায়, এমনি করে দেবতা আমায় শাস্তি দিলে, ঘা মারলে বৃদ্ধের দুর্ব্বল অসহ মনের ওপর। দেবতা, আর-যে সইতে পারিনে।"

ইওন বুঝতে পারল, কী দুঃসহ যাতনায় এ বৃদ্ধের অন্তর পুড়ে মরছে। স্বীয় অশ্রু-মোচন করে সে ফিডনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। এক সময়ে কেলেইস ও ইউক্রেটিসের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো, শৈশবে দুজনেই একসঙ্গে খেলাধূলা করত, বয়স হতে এক সঙ্গে চলা-ফেরা করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি থেকে যুঝত। ইওন ও অবাক হল এই ভেবে যে আজ কেন দুজন একত্রে মরণকে আলিঙ্গন করতে পারলে না। তবু ফিডনকে বললে হয়ত বিধাতা আরো মহত্তর কার্য্য কেলেইসকে দিয়ে সাধন করাবে বলেই তাকে রক্ষা করেছেন। হয়ত ওর হাতেই বিজয়ী শত্রুর নিপাত হবে।"

ফিডন এ কথায় সায় দিলো না। কোনো সান্ত্বনাই সে পেল না।

কিছুদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে, ফিডনের মনও শান্তভাব ধারণ করল। ইওন সময় বুঝে ফিডনকে অনুরোধ করল কেলেইসকে মার্জ্জনা করতে। বলল, "ওকে ক্ষমা করো ফিডন, সত্যি সে বেঁচে আছে বড়ো কিছু করবে বলেই। স্পার্টার গৌরবকে সে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনা।"

শুনে ফিডনের মন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল "কখ্‌খনো নয় ইওন, কেলেইসের কথা আর মুখে নিয়োনা, ক্ষমা সে আশা করতে পারে না।'

ইওন হতাশ হয়ে পড়ল। এ বিষয়ে দেবতার নামেও প্রকৃত স্পার্টানের হৃদয় কোমল হয় না।

এক'দিন ইওন স্বপ্নে দেখতে পেল, রাজা সমস্ত পলাতক সৈন্যদের ক্ষমা করতে চাচ্ছেন কিন্তু ফিডন তাঁকে বাধা দিলো এবং রাজসভার সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমার বিরুদ্ধে অভিমত দিলো। সে বলল, 'আমার দৌহিত্রও যুদ্ধ-পালিয়ে এসেছে। হয়ত স্পার্টা তার অপরাধ নেবেনা, কিন্তু আমি তাকে মার্জ্জনা করব না—না, কোনোও কালেও নয়।'

পরের দিন ইওন ফিডনকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলল। রাত্রিতে সে কেলেইসের যে-বিষাদমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছিল, তাতে তার দুঃখ আরো বেড়ে গিয়েছিল—সে আরো অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার স্বীয় সন্তানের মৃত্যুও তাকে এতখানি ব্যথিত করে তোলেনি যতখানি করেছে অভিশপ্ত কেলেইসের বিধ্বস্ততা। পরন্তু, ফিডনকে আরো অনুনয় করে বলল, "তাকে ক্ষমা করো ফিডন, তাকে এতটুকু মমতা করো।"

এবার ফিডনের মন একটুখানি দ্রবীভূত হল। সে বলল, "না আমি মুখ ফেরাব না। হাঁ, ইওন, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, হয়ত দেবতা কোনো শুভমুহূর্ত্তে তাকে ধন্য করবে। আমি তাকে ক্ষমা করবো। কিন্তু ঝাখো, এতেও আমার মন মানেনা—ভেঙে পড়ছেই।'

ইওন দেখল শেষ পর্য্যন্ত তার কথাই ঠিক রইলো। তার স্বপ্নটি একটি দৈববাণীর মতই মনে হল, কারণ দু'দিন পরে দেখা গেল, রাজার হুকুমে সমস্ত পলাতক সৈন্যদের অপরাধ মার্জ্জনা করা হল। সাধারণতঃ যারা যুদ্ধ-পালিয়ে আসে তাদের প্রতি দণ্ড ছিলো অতীব কঠোর, সুতরাং তাদের মুক্তি নিতান্ত বিস্ময়ের হয়ে দাঁড়াল। এও হতে পারে যে বহু সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে একটা-কিছু বিধান দেওয়া খুব সহজ নয়। যাহোক, তবু ফিডন দৌহিত্রের প্রতি একটুখানি স্নেহ না দেখিয়ে পারেনি—তাকে দেখবার জন্য সে কিছু উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লো। বলল, "সত্যি ইওন, তাকে অন্তর হতে ক্ষমা করা উচিত। দেশ যাকে ক্ষমা করেছে আমি তাকে অবহেলা করতে পারিনে। কিন্তু,

এতৎসত্ত্বেও তার আত্মবলিদানেই আমি অত্যন্ত খুশী হতাম। এবং সেইটেই আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হত, ইওন।"

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত অন্য রকম দাঁড়াল। পরাজয়ের সংবাদে যে অতিরিক্ত সৈন্যবৃন্দ পরাজিত জীবিত সৈন্যদের উদ্ধার সাধনে প্রেরিত হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যে তারা ফিরে এল আহত-অনাহতদের নিয়ে। তাদের আগমন সংবাদে সকলে পুলকিত হয়ে উঠল এবং আত্মীয়-পরিজন আনন্দ জ্ঞাপন করলো এই ভেবে যে অন্ততঃ তাদের দ্বারা আরো দেশসেবার আশা আছে।

ইওন ও সংবাদ পেল কিন্তু সারাদিন ঘরের বা'র হল না। রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে আপনমনে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকলো। আজ তার বেদনাতুর চোখে অশ্রু ছিলো না—মনেও বিশেষ কোনো গ্লানি ছিলো না। এমন কি সন্তানের আত্মদানে মনে-মনে একটুখানি গর্ব্ব অনুভব করছিলো এবং এ দুঃখমিশ্রিত গর্ব্ব সেদিন একলা গৃহের মধ্যে উপভোগ করতে তার একটু লোভ হয়েছিল।

কিন্তু সহসা দ্বার খুলে' ফিডন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তার চোখে কী-একটা উত্তেজনা, অস্থিরতার ভাব। অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলল, "কেলেইস ফেরেনি, ফিরে আসেনি। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম কি হল তার? কেউ বলতে পারলে না। তাহ'লে সে কি—"

বাইরের দরজায় কে যেন জোরে ধাক্কা দিলো। কিছুক্ষণ পরে একজন প্রতিবেশী—টিমোথিউস, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইওনের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করে বলল, "আমি ল্যাকটা থেকে এলাম। যুদ্ধ যখন অত্যন্ত তুমুল হয়ে উঠল তখন ইউক্রেটিস প্রাণপণে শত্রুপক্ষের গতিরোধ করে দাঁড়াল এবং শেষ পর্য্যন্ত যুঝে-যুঝে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাল—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—আরো প্রত্যক্ষ করেছি যে, তারই পার্শ্বে আর একজন তারই মতন অসীম সাহসিকতার সহিত যুঝে-যুঝে প্রাণদান করল। জীবনে যারা বন্ধু ছিলো মরণকালেতারা সে কথা ভোলেনি।"

"আহা, কে বেচারা আমার সন্তানের সঙ্গে মরণ বরণ করেছে?" দু হাতে জোরে বক্ষ চেপে ধরে ইওন জিজ্ঞেস করল। মুখখানি তার অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—অবশ্য চোখে জল ছিলোনা বিন্দুমাত্রও।

প্রতিবেশী যুবকটী উত্তর দিল "সে কেলেইস। আমাকে এখনই তার প্রপিতামহকে এ খবর দিতে হবে। অতএব যাই এখন।"

ফিডন এতক্ষণ আড়ালে থেকে শুনছিল, এবার মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়াল। বলল "তাকে আর বলতে হবে না, সে সব শুনেছে এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে যে তিনি তাকে গৌরবান্বিত করেছেন। যদিও মৃত্যুর পূর্ব্বে দৌহিত্রকে দেখবার তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিলো, তবু বিধাতার এ আশীর্ব্বাদকে নতমস্তকে সে গ্রহণ করলো।"

তৎপর ইওনের দিকে ফিরে বলল, "এখন আমরা তা'দিগকে মনে করব কারণ, এখনই কেবল দুজনে একত্রে গৌরব অনুভব করতে পারি। তাদের মৃত্যু আমাদের গৌরব দিয়েছে।"

মুহূর্ত্তকাল ইওনের চোখের সামনে ভেসে উঠল সন্তানের যুদ্ধমূর্ত্তি। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এতটুকুন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বলল, "হাঁ কেবল এখনই আমরা দুজনে একত্রে গর্ব্ব অনুভব করতে পারি বটে।"

এই হল স্পার্টানের হৃদয়ের শৌর্য্য ও তেজ।

তা'রা কিছুতেই জীবনে হতাশ হয়ে পড়ত না। তা'রা বিশ্বাস করত, দেহে যতক্ষণ শক্তি থাকবে ততক্ষণ মনেও আশা থাকার একটা প্রয়োজন ও সে প্রয়োজনের সার্থকতা অনেক। এবং এজন্যই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তা'রা সংগ্রামে পিছু হটতে চাইত না।

আমরা কি তেমন পারিনে?—

---

# অতীতের বাঙালী মহিলা কবি

## স্বর্ণকুমারী দেবী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথিত-যশা বাঙালী মহিলা কবিগণের মধ্যে প্রথমেই স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম করিতে হয়। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের সন্তান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা। ঠাকুর পরিবার বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভার আগার। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই পরিবারের প্রতিভাই নানাদিক দিয়া জগতের সম্মুখে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

বাঙলা ১২৬১ সালে স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালেই তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন, ছড়া বাঁধিয়া ছন্দে কথা কহিতেন। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া জীবনের প্রারম্ভেই সঙ্গীত-চর্চ্চায় অত্যন্ত কুশলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও অপূর্ব্ব বেগ-ব্যঞ্জনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় কবিতায় ও গানে তাঁহার প্রতিভা কতখানি উঁচুদরের।

'নিঃঝুন নিঝুম গম্ভীর রাতে
কম্পত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখল সজনী সতিমির রজনী
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতি,
ঝিল্লী ধ্বনি কৃত, বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।'

এ সঙ্গীতটি শুধু শব্দ ও সুরে সমন্বয় ঘটায় নাই, ইহা পূর্ণাঙ্গ কবিতাও বটে; এবং বোধ হয় এ জন্যই ইহা সর্ব্বজন বিদিত ও সর্ব্বজন প্রিয়।

"ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানিনা প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
"আমি চাহিনা অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহিনা মুক্তি, চাহিনা সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।"

তাঁহার এই সাধনা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। উপরের লাইন কয়টী স্বর্ণ কুমারীর 'গাথা' নামক কাব্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। 'গাথা' ১২৮৭ বাঙলা সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই যুগে এই কাব্যগ্রন্থখানি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

এইগুলি স্বর্ণকুমারীর রচিত কাব্যগ্রন্থ।—১। গাথা, ২। কবিতা ও গান, ৩। বসন্ত-উৎসব (গীতিনাট্য), ৪। দেব কৌতুক ও যুগান্ত (কাব্যনাট্য), ৫। কনে বদল এবং ৬। গীতিগুচ্ছ। গাথায় চারিটি বিয়োগান্ত কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে। ইহাদের বিষয় বস্তু প্রেমের ব্যর্থতা ও বিরহ-বিষাদ। প্রত্যেকটি গাথাই প্রসাদ গুণে

অপূর্ব্ব, ইহাদের বর্ণনা, ভাষা ও ছন্দ স্বভাবদত্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ছোট্ট, সরল অথচ রসপুষ্ট আঙুরের মতই পাঠকের তুষ্টিসাধন করে।

গদ্য সাহিত্যের দিক দিয়া স্বর্ণকুমারীর স্থান কাব্যের অপেক্ষা উচ্চে। তাঁহার রচিত প্রায় একশত গদ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার জীবনের একটা গৌরবময় কীর্ত্তি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদন। দুইবারে তিনি আঠারো বৎসরের জন্য এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে 'ভারতীর' দান সাহিত্যের প্রবলানুরাগী কোনো পাঠকের অবিদিত নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতি' সেদিনের কলিকাতায় একটি বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহা নারী-প্রগতিকে একটি অসাধারণ প্রেরণা দিয়াছিল।

অল্পদিন হইল স্বর্ণকুমারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গের মহিলা-সাহিত্য যেরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল তাহা অপরিশোধনীয়। তবু হতাশার কিছু নাই। তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে হয়, "পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্ত্তমান নূতনে। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের মৃত্যু।"

স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কবিতা অমর ও চিরনূতন!

---

## গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

স্বর্ণকুমারীর সমসাময়িক যে-মহিলা-কবি বাঙলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তিনি ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী,—স্বর্ণকুমারীর সখি। দুই জনেই একই সালে একই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারীর ন্যায় গিরীন্দ্রমোহিনীও অল্প বয়স হইতেই কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। হয় তো প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা একই নক্ষত্রের প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু উভয়ের কাজের সুর একরকম নহে। স্বর্ণকুমারীর কবিতার বহিরাভরণ অপূর্ব্ব, তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখাগুলিই ছন্দ-মাধুর্য্যে মনোহারী। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা আন্তরিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ—ইহাদের গোড়াপত্তন জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা বেদনার উপর এবং সে জন্যই তাঁহার কবিতা পাঠকের নিকট অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তির মনের উপর

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তাঁহার কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী করিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার চৌধুরী ও দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাকে আন্তরিক ছন্দো-শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিয়াছিলেন।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য সাধনা সুরু হয় 'গণেশ-বন্দনা' লিখিয়া। দুঃখের বিষয় সে রচনা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী দুইখানি কাব্যগ্রন্থ 'ভারত-কুসুম' ও 'কবিতা-হার' "জনৈক বঙ্গ মহিলা" কৃত বলিয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইখানি গ্রন্থই পাঠকবর্গের নিকট হইতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে' কবিতা-হারের সমালোচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "শৈশবে যে কবি-প্রতিভার ক্ষীণ রশ্মি প্রকাশ পাইয়াছিল, কালে তাহাই বাঙলা কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছে।" 'কবিতা-হার' পাঠে পুলকিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় গিরীন্দ্রমোহিনীকে স্বীয় নাটকাবলী উপহার প্রদান করেন।





'অশ্রুকণা' কবির তৃতীয় ও প্রধানতম গ্রন্থ এবং ইহাতেই তাঁহার সমগ্র কাব্যের মূলসুর ধরা পড়ে। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহারই তাপে এই তপ্ত অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী বলেন, "তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনও কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দূর্ব্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ গিরিন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে।...কল্পনাস্নিগ্ধ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ চরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে।"

"অশ্রুকণায়" কবি বলিতেছেন—

এ নয় সে অশ্রু রেখা,
মানান্তে নয়ন কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না
দেখা হলে ফুলবনে;
সে অশ্রু এ নয় সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল ঘরে।
এ শোকাশ্রু!—নিরাশার যাতনা গরল ঢাকা,
এ শোকাশ্রু!—বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু!—হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু!—জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।

'অশ্রুকণার' প্রত্যেকটী কবিতার মধ্যে বেদনার করুণ সুর রহিয়াছে।

মোটের উপর গিরীন্দ্রমোহিনী দুঃখের কবি। মানুষের দুঃখের কারণ নানারকমের, নানা বিরুদ্ধ ঘটনার সংঘাতে ইহার উৎপত্তি। গিরীন্দ্রমোহিনীর দুঃখ 'পাইয়া-হারাণোর' বেদনায় সঞ্জাত এবং ইহা হইতেই তাঁহার মনে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মৃত্যুর পরে মানুষ যায় কোথা এবং কেন এ জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী? বুদ্ধদেবের কর্ম্মফল-বাদই তাঁহার সিদ্ধান্ত। অশ্রুকণার পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'আভাষ'—তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থ 'শিখা', 'সিন্ধুগাথা', 'স্বদেশসেবা' ইত্যাদি। গিরীন্দ্রমোহিনী শুধু শোকের কবিতাই লেখেন নাই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বাৎসল্য রসের কবিতাও লিখিয়াছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকৃতি ছিল একান্ত কবিজনোচিত। মিষ্ট-মধুর ভাষিণী, নিরাড়ম্বরা ও অগর্ব্বিতা গিরীন্দ্রমোহিনী স্বীয় পরিবারস্থ লোকদের ও বন্ধুদের খুবই আপনার লোক ছিলেন।

---

## প্রমীলা নাগ

বিক্রমপুরের কবি প্রমীলা নাগ স্বনামখ্যাত মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী। প্রমীলার প্রসিদ্ধিকাল বাংলা ১২৯৮—১৩১৫-১৬। ইনিও অতি অল্প বয়স হইতে

স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ

কবিতা লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অল্পসংখ্যক মহিলা কবিদের মধ্যে প্রমীলার স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ইঁহার কবিখ্যাতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, অকাল মৃত্যুর জন্য ইনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই!

প্রমীলা নাগের কবিতার বৈশিষ্ট্য দুঃখবাদে। জগতের কোনোদিকে চাহিয়াই তিনি কোনো আশার বাণী প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। যে দিকেই চাহিয়াছেন শুধু দুঃখ, শুধু বেদনা, শুধু ম্লান বিপদের ছবি অমাবস্যা রাত্রির নিঃসঙ্গ পথিকের সম্মুখে পথ ভোলানো আলেয়ার মতো, তাঁহার নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। চারিদিকে একটা ব্যর্থ-আশার অথবা নিরাশার তিমির-দৃশ্যই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই গাহিয়াছেন,—

"আজ, কেহ নাই, কিছু নাই, বাসনা গিয়াছে মরে
জীবন-মৃতের সম একাকী রয়েছি পড়ে
কল্পনার প্রাণ নাই, হৃদয় শ্মশান পুরে
স্মৃতি শুধু কেঁদে মরে আঁধারেতে ঘুরে ঘুরে।"

কিন্তু কোনো মানুষের জীবনের অবস্থাই তো একঘেয়ে, নিরানন্দ নয়; মানব-জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিও ইহার পক্ষপাতী নয়। ইহাতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব আছে, অতিরিক্ত দুঃখ ভোগের মধ্যেও একটুখানি ক্ষীণ আনন্দের আভাষ আছে তাই প্রমীলার কণ্ঠেও শুনিতে পাই—

"অন্ধকার যামিনীর পরে
প্রথম সে চন্দ্রমার হাস
কুহেলিকা আঁধারের মাঝে
উষার সে অরুণ আভাষ।"

—এর গান এবং এজন্যই তাঁহার কাব্য কেবল hypochondriac নয়।

—:—

## সরোজ কুমারী দেবী

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সরোজ কুমারী জন্মগ্রহণ করেন—তিনি সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ভগিনী। অল্প লিখিয়া যাঁহারা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছেন সরোজ কুমারী তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

'হাসি ও অশ্রু' তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থ—'অশোকা' ও 'শতদল'। 'হাসি ও অশ্রু' ভাব-সম্পদে ও লিপি-কৌশলে কবি-জনোচিত বলিয়াই মনে হয়। ইঁহার খণ্ড কবিতাগুলি প্রবল উচ্ছ্বাসহীন, স্নিগ্ধ এবং ইহাদের মধ্যে কবি-কল্পনাও কিছু আছে।

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

'অশোকা' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। ইহার কবিতাগুলিকে তিনটি পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। গীতি-কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নায়ক নায়িকাদের উদ্দেশ্যে লিখিত সনেটাবলী, এবং অনূদিত কবিতা সমূহ। অধিকাংশ কবিতাই 'সরল ও মিষ্টভাবপূর্ণ।'

'শতদল', ভক্তিপূর্ণ কবিতায় শতদলের মতোই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে—সেগুলি বিচিত্রও বটে, সৌরভপূর্ণও বটে। বিধাতার উপর নির্ভর স্থাপন 'শতদলের' কবিতার বিশেষত্ব।

আরেকটি জিনিষ তাঁহার কবিতাকে মাধুর্য্য প্রদান করিয়াছে—তাহা দাম্পত্য প্রেম। মনে হয় পারিবারিক জীবনের শান্তিই তাঁহার কবিতাকে স্নিগ্ধতা প্রদান করিয়াছে।

দুঃখের কবিতা তাঁহার লেখায় নিতান্ত অল্পই যদিও মহিলারা সাধারণতঃ বিষাদপূর্ণ কবিতা লিখিতে ভালোবাসিয়া থাকেন। সামান্য দুঃখ যাহা তাঁহার কবিতায় আছে তাহা স্বীয় সন্তান-বিয়োগ জনিত দুঃখ।





## হিরন্ময়ী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবীকে যাঁহাদের মনে পড়িবে, তাঁহারা তাঁহার কন্যা হিরন্ময়ীকে ভুলিতে পারিবেন না। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পর্কে তাঁহাকে মনে পড়িবেই—তিনিও কিছুকাল

স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী

'ভারতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারীর 'সখি-সমিতির' তিনিই কর্ম্মকর্ত্রী ছিলেন। কাব্য-জগতে তিনি যথেষ্ট প্রখ্যাতা না হইলেও তাঁহার এই সমস্ত কর্ম্ম ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যসমূহের জন্য তিনি দেশবাসীর স্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন। সখি-সমিতি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে তিনি বিধবা-আশ্রম খুলিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। আশ্রমবাসিনীদের সুশিক্ষার জন্য তিনি যে যত্ন নিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

হিরন্ময়ী ইং ১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর বয়স হইতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

পনেরো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশই অকালে মৃত্যু-কবলে পতিত হয়। বোধ হয় সন্তান-শোকই উত্তর কালে তাঁহার কবিতায় একটু ম্লান ছায়াপাত করিয়াছে।

কবিতায় যদি নিছক তত্ত্ব কথা থাকে, তাহা হইলে তাহা কবিতা না হইয়া হিতোপদেশ হইয়া দাঁড়ায়। হিরন্ময়ীর সংখ্যালঘু কবিতাগুলি এ দোষে দুষ্ট ছিল না, কোনো গুরুতর সমস্যার মীমাংসা সেগুলিতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দু একটি জীবন-রহস্যের কথা কবির মনে জাগে,—বস্তুতঃ কবির কবিতা জীবনেরই সমালোচনা। হিরন্ময়ী সে রহস্য মাঝে মাঝে সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্য ময়
অনন্ত এ বিশ্ব
দেখ সেথা কিবা গায় কোন্ কথা বলে তোরে
প্রতি নব দৃশ্য।
ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি
বিলাপের স্থান,
এক যায় এক আসে নব নব মুখ ভাসে
স্মৃতি অবসান!
ইত্যাদি।

এই কবির পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে যে সত্যটি রূপ পাইয়াছে তাহাকে poetic truth বলা যাইতে পারে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিরন্ময়ী সাহিত্য সাধনা ও দেশ সেবা করিয়া গিয়াছেন।

## উমা দেবী

বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত মহিলা কবি বাঙলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাধারাণী দত্ত, নিরুপমা দেবী, লীলা দেবী, উমা দেবী এবং আরো দুই একজন মাত্র বিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে উমা দেবীর বৈশিষ্ট্য আধুনিক কালের সাহিত্যিক রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিস্মিত করিয়াছে।

স্বর্গীয়া উমা দেবী

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার অকাল মৃত্যু, দেশের কাব্য-রসিক সমাজকে হতাশ করিয়াছে। মৃত্যু কাহাকেও অমর করে, আবার কাহাকেও অমরত্ব হইতে বঞ্চিত করে। উমা দেবীর বেলায় শেষোক্তিটিই সত্য।

উমা দেবীর পিতা অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এবং মাতা সুলেখিকা সুনীলা দেবী। তাঁহারা উমা দেবীর অল্প বয়সেই তাঁহাকে সংসারের নানা আবর্ত্তের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। উমা দেবীর শৈশব তাই অত্যন্ত দুঃখে কাটিয়াছে।

উমা দেবীও অত্যল্প বয়সেই কবিতা রচনায় হাত দেন। তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থ, 'ঘুমের আগে' চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ইহা শিশু মনের অপূর্ব্ব খাদ্য, তাহাদের মন-ভুলানো স্বপ্ন-কাহিনীর সু-অঙ্কিত রূপলেখা।

চল্লিশটি কবিতার সমষ্টি 'বাতায়ন' (বৈশাখ, ১৩৩৭) তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। কবিতা-সঙ্কলন হিসাবে ইহাই তাঁহার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ এবং ইহাই তাঁহার swan song.

বাতায়নের কবি বিংশ শতাব্দীরই একজন মহিলা প্রতিনিধি। জীবনের ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা এবং ছোট্ট জীবনের ছোট ছোট লীলাকে রূপায়িত করা আধুনিক কালের কবিতার বিশেষত্ব। উমা দেবীর রচনায় এ স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট এবং সু-অঙ্কিত। যে হৃদয়াবেগ ও চিত্তানুভূতি সকল কালের সকল কবিতার প্রাণবস্তু, তাহা উমা দেবীর রচনায় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান এবং সেই জন্যই তাঁহার কবিতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী তাঁহার দৃষ্টি প্রকৃত স্রষ্টার কৌতূহলী দৃষ্টি!

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়ন' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই 'ছায়াছবির' বানানো পদার্থগুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিতে বিশিষ্টতা আছে।"

উমা দেবীর অকাল মৃত্যুতে শুধু বাঙলার মহিলা-সাহিত্য নয়, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

---

## পঙ্কজিনী বসু

পঙ্কজিনী বসু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরের শ্রীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তেরো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং বিবাহের অনতিকাল পর হইতে তাঁহার কবিতা রচনার ক্ষমতা বিকশিত হইতে থাকে। কিন্তু সে শক্তি বিকাশের





পূর্ণতায় না পৌছাইতেই পঙ্কজিনীর অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু-কালে (১৩০৬ বাং) তিনি মাত্র সতেরো বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যেমন অল্প ছিল, পড়াশুনাও সেইরূপ সামান্য ছিল। পিতৃগৃহে মাত্র রামায়ণ, মহাভারত ও টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদই পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অবশ্য স্বামীগৃহে তাঁহার পড়াশোনার আরেকটু সুযোগ সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও খুব বেশী নয়। কিন্তু যাঁহার ভিতরে প্রতিভা আছে অনেক সময়ে তাঁহাকে বেশি পড়াশোনার জন্য বসিয়াও থাকিতে হয় না।

১৩০৮ সালে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাঁহার তত্ত্বাবধানে ও যাঁহার ভূমিকা সম্বলিত হইয়া তাহা প্রকাশিত হয় তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় সে পুস্তক প্রকাশিত হইলেও প্রচারিত হয় নাই—সেজন্য ১৯১৬ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির নাম 'স্মৃতিকণা'। ইহার কবিতাগুলি চারিভাগে বিভক্ত। (১) আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক, ( ) প্রেম বিষয়ক, (৩) সামাজিক, (৪) প্রকৃত ঘটনা ও আত্মবিষয়ক। জীবিত কালে তাঁহার দুই চারিটি কবিতা 'নব্য ভারত' ও সখী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পঙ্কজিনীর প্রতিভা ধর্ম্মভাব সম্পন্ন। তাঁহার বেশীর ভাগ কবিতাতেই জীবন মৃত্যুর সমস্যা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরলোকতত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব ইহাদের বিষয় বস্তু। প্রত্যেক ধর্ম্মই এসব বিষয় লইয়া কম-বেশী আলোচনা করিয়াছে। পঙ্কজিনী মৃত্যুর পরবর্ত্তী রাজ্যে শান্তি খুঁজিয়াছেন, স্বর্গ নিশ্চয়ই আছে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

"না, না, স্বর্গ নিশ্চয় যে আছে
চিরশান্তি সুখময় স্থান,
অপ্রেম, অশান্তি, শোক, দুখ
সেথা গেলে হইবে নির্ব্বাণ।"

জগতের বড় বড় কবিগণ অনেক সময়ে সুখ কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। পঙ্কজিনী সুখ খুঁজিয়াছেন বর্হিজগতে নয়, অন্তর্জগতে। আপনার অন্তরই হইল পঙ্কজিনীর মতে সুখের আবাসস্থল।

পঙ্কজিনীর কতকগুলি কবিতা বাঙালী চরিত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তি। বাঙালী চরিত্রের বাগাড়ম্বর, নিরর্থক আস্ফালন এবং বাহ্যিক বাবুয়ানা, তাঁহার হাতে যে কষাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সুতীব্র ও ক্ষমাহীন। পঙ্কজিনী বাঙালীর অক্ষম জীবন যাপনের গ্লানি সহিতে পারেন নাই।

স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু

পঙ্কজিনীর কবিতায় একটা বিশ্ব-মানবতার আভাষও পাওয়া যায়। Whitm n Democracy'র গান গাহিয়াছেন, পঙ্কজিনী দুঃস্থ দরিদ্রের ওপর সবলের অত্যাচারকে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। এবং এজন্যই তাঁহার জীবনে একটা সেবাবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, পরের জন্য সেবাময়ী কল্যাণী মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে পথ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল।

পঙ্কজিনীর জীবনে কবি-প্রতিভা বিকশিত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁহার জীবনকে সে সুযোগ প্রদান করে নাই।

---

## কামিনী রায় বি-এ

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায়কে অতীতের বাঙ্গালী মহিলা কবি দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় নাই। কিন্তু লেখা প্রেসে দিবার পর সহসা সংবাদ পাইলাম গত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তিনি নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার কলিকাতার হাজরা রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে ছিল দেশের পাঠক সমাজের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

১২৯৮ সালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'যমুনা-কল্পনা'

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

পাঠ করিয়া তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং যমুনা-শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন।

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই "আলো ও ছায়া" পাঠ করিয়া কবিবর হেমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে কবির সুখ্যাতি করেন এমন কি তিনি বলেন, "বইটি পড়িতে পড়িতে……স্থল বিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" সে সময়ে পুস্তকে কবির নাম ছিলনা।

কামিনী রায়ের বিরাট কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিবার মত স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তাঁহার "কবিতাগুলির প্রধান গুণ, তাহার কোনোখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই—ছন্দের আড়ষ্ট ভাব নাই—তাহা অবান্তর চিন্তা-তরঙ্গে পাঠকের চিত্তপীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু, স্বচ্ছ, নির্ম্মল।"……তাঁহার কবিতা যে কিরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ, নিম্নে উদ্ধৃত দু'এক টুকরা দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

পতিতের উদ্দেশে তিনি লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল একসাথে,
পথে নিভে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া ক'রে, তুলিবেনা হাত ধ'রে,
অর্দ্ধদণ্ড তারি লাগি থামিবে না, ভাই?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধ'রি হোক অগ্রসর;
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।"

অন্যত্র—

"পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নতশিরে;
সম্মুখে চলেনা পদ, তুলিতে পারেনা আঁখি,
কাছে গিয়ে হাত ধ'রে ওরে তোরা আন্ ডাকি।"

অবশ্য এরূপ টুকরা দৃষ্টান্তে তাঁহার মত কবির পরিচয় দিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা—আমরা পাঠকগণকে তাঁহার কাব্য-গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।



# নারীজাতি ও রাজনীতি

—শ্রীসরলাবালা সরকার

মানুষের সমাজ-জীবনের প্রথম উষাপাত হ'তে আরম্ভ ক'রে এপর্য্যন্ত দু'টো জিনিষ পুরুষ আর নারীকে তফাৎ ক'রে রেখেছে। জিনিষ দুটো এই,—পুরুষ আর নারীর প্রকৃতিগত বিভেদ, আর নারীর পুরুষকে সম্মোহিত করবার যে-শক্তি আছে তা'তে পুরুষের ভয়।

প্রথমতঃ নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করা যাক। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এ সম্বন্ধে বলেন,—"নারী আর পুরুষের আকার অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন রকমের হওয়ার জন্যে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে উভয়ের কাজের গণ্ডী পৃথক পৃথক হ'য়ে পড়েছে। পুরুষের দেহ প্রকৃতির বাঁধন হ'তে অনেকটা মুক্ত। বিশেষতঃ সন্তান-প্রজনন কার্য্যে পুরুষের কর্ত্তব্য খুবই সোজা। এজন্য নারীকে যেমন দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে বহন করতে হয়, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন তাকে দেখাশুনা করবার জন্য মাকে আরও দীর্ঘতরকাল অপেক্ষা করতে হয়; পুরুষের এসব বালাই নেই। তাই পুরুষ পেয়েছে আপন কৃতিত্ব দেখাবার দীর্ঘতর অবসর, যা'তে ক'রে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছে; আর নারীকে ঘরের কোনে ছেলেপিলে নিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। এই মূল প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্যই পুরুষ নেতা, রাজা বাদ্‌শা, ওস্তাদ, মুনি-ঋষি, আবিষ্কর্ত্তা ইত্যাদি হয়ে আসছে চিরদিন।

অনেকে হয় ত ভাববেন মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের দৈহিক বল বেশী তাই পুরুষ নারীকে অধীনতার শিকলে আটকে রেখেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয় কেবল গায়ের জোরে কেউ কখনও উপরে উঠ্‌তে পেরেছে তা বর্ত্তমান যুগে ত নয়-ই, অতীতের বর্ব্বরতার যুগেও তা সম্ভবপর হয়নি। অসভ্যদের ঝাড়া-জলপড়া, টোটকা যাদুমন্ত্র ইত্যাদিতে বিশ্বাস এবং এ সব ওঝাদের অসভ্যদের উপর নেতৃত্ব হ'তেই বুঝা যায়, মানুষ চিরদিন যোগ্যতারই কদর করে এসেছে। কোন বিষয়ে কেউ বিশেষ যোগ্যতা দেখালেই পরিবারভুক্ত বা সমাজের লোকজনের দৃষ্টি তার উপর প'ড়ে তাকে সর্দ্দার বা গোষ্ঠীপতির সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। এস্কিমোরা একমাত্র সবজান্তাকেই তাদের নায়ক-পদে এখনও বহাল ক'রে থাকে।

পুরুষ আর নারী তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য দুজনে ঠিক দুটো বিভিন্ন রাস্তায় চল্‌বে, এ নিয়মের সময় সময় নড়চড়ও উপস্থিত হয়। দু'টো কারণের জন্য এরূপ ঘট্‌তে পারে। পুরুষজাত অবনত হ'য়ে নারীদের সমান এমনকি নারীরও অধম হ'য়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতার ইতি-কথায় এরূপ নজীর আছে ঢের। বর্ত্তমানে উত্তর আমেরিকার বর্ব্বর জাতিদের মধ্যেও এমনধারা নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও এরূপ অবস্থা ঘট্‌তে শুরু করেছে। নর আর নারী সমান হ'লেই বুঝতে হ'বে পুরুষ অবনত হ'য়ে পড়েছে। পুরুষ অবনত হওয়ার ফলেই নারীকে পুরুষের চেয়ে অগ্রগামী ব'লে বোধ হয়।

নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ব্যবধান মুছে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ, নারী আর নারী থাকতে রাজী নাও হ'তে পারে। আপন যৌন-জীবনের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে নারী ক্রমেই পুরুষের কাজ অবলম্বন করতে পারে। অতীতের 'দাহমে' নামক স্থানের লড়ুয়ে মেয়ের দল ছিল ঠিক এরূপ পুরুষালী মেয়ে মানুষ। ইউরোপের অবিবাহিতা যুবতীরাও ঠিক এই

পর্য্যায়ের। তবে ইউরোপের কুমারীরা অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে একায়িক গতর খাটিয়ে রুটীর যোগাড় কর্ত্তে বাধ্য হয়। সেজন্য এদের প্রকৃত নারীত্বহীন মেয়ে মানুষ মনে করা ঠিক হ'বে না।

নারী আর পুরুষের জীবন যাত্রার প্রণালী পৃথক হ'বার দ্বিতীয় কারন যে, পুরুষের নারী-বিভীষিকা, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। মানুষের বলবীর্য্য হ্রাস এবং দৈহিক স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার তালে তালে নারী-পুরুষের মধ্যবর্ত্তী ভেদরেখা ক্রমে বিলীন হ'য়ে এসেছে।

সমাজের উন্নতির স্রোত থেমে যাবে ভেবেই প্রাচ্যের দেশগুলিতে নারী আর পুরুষের মধ্যে ভেদরেখা এমন স্পষ্ট ভাবে টানা হয়েছে। প্রাচ্যের পর্দ্দাপ্রথা, অন্তঃপুরের ব্যবস্থা এখনও এর স্বাক্ষ্যরূপে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীচ্যে গ্রীকরাও নারী পুরুষের পৃথক পৃথক কর্ম্মগণ্ডী নিরূপণ করে। পুরুষের জীবনের কিয়ৎকাল এবং দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা নারীর মুখ দেখা মহাপাপ এরূপ ব্যবস্থা অনেক সমাজেই মেনে নেয়। প্রাচীন গ্রীসে কুমারীদের সকলেই ভক্তি ও পূজো করতো। আমাদের দেশের ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরা এখনও জনসাধারণের ভক্তির পাত্র। প্রাচীন গ্রীসের ব্রহ্মচারিণী শ্রেণীর পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর নারী ও উদ্ভূত হয়। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন অধিকার হ'তে বঞ্চিতা হয়েও এরা গ্রীক রাষ্ট্রনেতাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

রোমক সম্রাটদের আমোলে রোমের গৃহিণীরা যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নাই। এঁরাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্য চালাতেন।

রোমান সম্রাটদের আমোলে নারী এরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে' এলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী আবার পরাধীন হয়। গোটা মধ্যযুগে নারী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারনি। রেনেসাঁসের অর্থাৎ, আধুনিক যুগে য়ুরোপ আবার নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে; স্বীকার করেচে যে, নারী-স্বাধীনতা এবং নারীর প্রভাবের প্রয়োজন আছে। মধ্যযুগীয় আবহাওয়া হ'তে মুক্তি লাভের জন্য রেনেসাঁস অর্থাৎ আধুনিক যুগের আবির্ভাব হয়। প্রথমে অবশ্য লড়াই ঘোষণা করা হয় 'চার্চ্চের' বিরুদ্ধে, যার ফলে প্রটেষ্টাণ্ট মত দেখা দেয়। তারপর আবার সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরই পরিবর্ত্তন শুরু হয়। নারী আবার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে থাকে। এসম্বন্ধে সেরা হচ্ছে ফরাসী জাতি। ফ্রান্সে নারী-আন্দোলন আরম্ভ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সভায় তখন নারীর ভারী জাঁকজমক। অষ্ট্রিয়ার রাণী এনিও নারী-আন্দোলনের এক জন কর্ণধার। ক্রমে নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। এই নারী-সাহিত্যে জোরের সহিত প্রচার করা হয় যে, নারীর আপেক্ষিক হীনতা তার প্রকৃতিগত নয়, শিক্ষার দোষেই নারী এমন হীন হয়ে পড়েছে। সাহিত্যিকের দল আরও বলেন যে নারী আর পুরুষের মগজের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কোন কোন সাহিত্যিক আরও এগিয়ে প্রচার করতে থাকেন, নারী পুরুষের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়। রাষ্ট্রজ্ঞান, সাহস, ধর্ম্মনিষ্ঠা, হিসাব-জ্ঞান পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশী। একজন নারী-সাহিত্যিক পুরুষকে বামনাকৃতির ক্ষুদ্র জীবরূপেও পরিকল্পনা করেছেন।

পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর যুদ্ধ-ঘোষণা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে। এমন কি পুরুষকে বর্জ্জন করবারও মত জাহির করা হয়। নারীর চিরকৌমার্য্য, প্লেটোসম্মত স্বর্গীয় প্রেম এবং যৌনসঙ্গমের বীভৎসতার প্রতি নারীর মন আকৃষ্ট করা হয়। সন্তান প্রসব করার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন চলতে থাকে। পুরুষকে ঘৃণা করে' চলাও নারীদের বিশেষত্ব হয়ে ওঠে। জন্মনিরোধ করার জন্য মেয়েরা উঠে'-পড়ে' লাগে।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া হতে ফরাসী সমাজে নারীর প্রভাব ক্রমাগত বেড়েই চলে। ক্রমে ফ্রান্সে মেয়েরা বলীয়ান হয়ে ওঠে ঠিক সাম্রাজ্যবাদী রোমের মেয়েদের মতো। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমোলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রগরিমার দীপ্ত মধ্যাহ্নকাল হ'লেও এঁদের আমোলে রাজসভায় অভিজাত এবং নারীদের যে যথেচ্ছাচারিতার স্রোত চলেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত হয় ফরাসী বিপ্লেবর মরণাহবে।





সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ফরাসীদের দেশে নারীর প্রভাব অব্যাহত থাকে। একজনের পর আর একজন নারী রাজাকে সাম্‌নে রেখে দেশ শাসন করতে থাকেন। ইংলণ্ডের অবস্থাও ছিল ঠিক এমনি ধরণের। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স ছিল একই রাজার অধিকারভুক্ত। ৪র্থ হেন্‌রী এই দুই দেশ শাসন করতেন বটে, কিন্তু রাণী মেরি ডি মেডিসিই প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তৃণ করতেন।

রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ সনে ইংলণ্ডের রাজা হন। ইনি ছিলেন মেরি ডি মেডিসির পৌত্র। ফরাসী রাজসভার ভাব-ধারণায় তাঁর মন ভরপুর। কেবল রাজার মনেই যে নারী প্রীতি জেগে উঠেছিল, তা নয়। ইংলণ্ডেও তখন নারীপ্রীতির ছোঁয়াচ এসে লেগেছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ব্যবধানই বা কতটুকু। একটী প্রণালীর দূরত্ব বইত নয়। দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনারোহণের পর ২৫ বৎসর ধ'রে ইংরেজদের দেশে চল্‌লো নারীর অধিনায়কত্ব। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বের প্রথম ভাগে দেশ-শাসনে রাজার উপর হুকুম চালাতেন ইংলণ্ডের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লেডী ক্যাইল্ মেল্। রাজা অধিকাংশ সময় এই রূপসী মহিলার সাহচর্য্যেই কাটাতেন। চার্চ্চ বিভাগে বা শাসন বিভাগে পদোন্নতি লাভ করতে হ'লে লেডী ক্যাইল মেলের সুপারিশই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, কোন দেশ বা জাতির জীবনে যখন প্রগতির যুগ চলেছে তখন পুরুষকে বলবীর্য্যসম্পন্ন দৈহিক বলশালী রূপেই দেখা গিয়েছে; আবার পুরুষ যখন নীতিভ্রষ্ট দুর্ব্বলদেহ এবং শ্রীহীন হয়ে পড়েছে তখনই নারী এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নানাপ্রকার অত্যাচার এবং অনাচারের অবতারণা করেছে। সুতরাং নারী সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণীভূত নয়; পুরুষই প্রকৃতপক্ষে উন্নতি-অবনতির মূল কারণ। পুরুষ যদি দেহে-মনে সুস্থ এবং সবল থাকে তা হলে নারী সুপ্রভাবই বিস্তার করবে সন্দেহ নাই।

---

# ভুলে গেছ হে ধরণী

—শ্রীবিমলা দেবী

ভুলে' গেছ হে ধরণী, নাহি পড়ে মনে ?
বসন্ত-নিশীথে তব কুসুম কাননে
সে যে তুলেছিল ফুল, গেঁথেছিল মালা
অন্তর আভায় রাঙি, ফাগুনের ডালা
পরিপূর্ণ করেছিল সুখে আর দুখে,
যখন যা পেল' তাই পরম কৌতুকে

টানিয়া লইল বুকে! সে লীলা-খেলায়
তাহার অন্তর লোকে কত অবেলায়
আপনার পরিচয় পেলে নব-নব,
তোমারে দিয়েছে ভাষা তার কলরব!
আজ তারে ভুলে' গেছ, বিস্মৃতীর তীরে
তারে দিলে বিসর্জ্জন অনন্ত তিমিরে!
দুর্গম কাঁটার পথে নিশিদিন চলি
সহস্র ভরসা দিয়ে জীবন-অঞ্জলি
সদাই রচিয়াছিল; কত আয়োজন,
কত আশা, ভালবাসা, করিয়া চয়ন
রচিল আপন নীড়; তুমি তার পরে
জননীর আশীর্ব্বাদ স্নিগ্ধ স্নেহভরে
বুলাইলে প্রতিদিন; অতি অন্যমনা
জাগালে পথিক মনে একান্ত প্রার্থনা,
'মৃত্যু নহে, আমি চাহি নিত্য-অমরতা।'
মাটির মানব, তাই ম্লান-নিষ্ফলতা
স্বপ্ন ভাঙি দিলো তার। ফিরে গেল চলে
দুরন্ত কালের স্রোতে কোন শূন্যতলে
তমসা তীর্থের যাত্রী। নাহি পড়ে মনে
সে দিনের সে কাহিনী বিস্মৃত স্মরণে!

# স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান ভারত

—কুমারী শ্রীমতী ছায়া দেবী—

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ভাব-সাধনার এক বিরাট তপোমূর্ত্তি। আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাসে বেদব্যাসের পর তরুণ বয়সে একাধারে এত বিষয় চিন্তা ও ধ্যান করিবার শক্তি এবং সামর্থ্য একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, স্বদেশপ্রেমিক ও নব্যভারতের জয়যাত্রার প্রথম ও প্রধান ঋষি।

রাজা রামমোহন রায় হইতে ভারতবর্ষের নব-জাগরণের যুগ। রাজা রামমোহন রায় নিজে শাক্ত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই যুগে একমাত্র রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর প্রখর বুদ্ধি ও বহু চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় সমস্ত হিন্দু জাতির সব বিষয়ে উন্নতির শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই জন্য তিনি সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। রাজনীতি তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য ছিল না। তিনি নব্য-ভারতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মিলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ এই দুইটির প্রভাব তাঁহার ভিতর যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী এ জ্ঞান রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত ব্রাহ্ম সমাজের ভিতর তৎকালে আর কাহারও ছিল না। সে সময় পরাধীন জাতীর ব্যথা তাঁহার মত কেহ ততটা অনুভব করিতে পারেন নাই।

স্বামী বিবোকানন্দ কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের প্রথম জাগ্রত প্রতীক্। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম জাতির জয়যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ত্যাগ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও তেজোদীপ্ত বাণী জাতিকে সজাগ করিয়া দিল। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "অনেক ঘুমিয়েছিস, এখন মানুষের মত মানুষ হয়ে একবার দাঁড়া। আহাম্মক! তোর সমাজ, তোর ধর্ম্ম-কর্ম্ম তোর দেশ জাহান্নামে চলে' যাচ্ছে আর তুই এখন ঘুমুচ্ছিস্? নিজের মঙ্গল নিজে যদি না করিস তোর মঙ্গল কেউ করবে না।"

বাল্যকালে যদিও স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের জন্য মিশিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষরূপে বিস্তার করিতে পারে নাই। স্বামীজীর সময় কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গীয় যুবকদের একমাত্র নেতা ছিলেন। তাঁহার বাক্য যুবকদের নিকট বেদবাণী বলিয়া মনে হইত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের উপর কেশবচন্দ্র সেনের কোন প্রভাবই পড়িল না। বাল্যকালে স্বামীজীর জীবনে দুটি ব্যক্তির প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে—বুদ্ধদেবের ও হার্ব্বার্ট স্পেনসারের। চিন্তাজগতে দুজনেই বিপ্লবী ছিলেন। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্ত্তী জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-বিপ্লবী হইয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবই তাঁহার জীবনে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্র-শিষ্য হইলেও, তাঁহার নিজস্ব একটি চিন্তাধারা বিশ্বকে দিবার ছিল, এবং তাহা তিনি নির্ভীক হৃদয়ে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতের ব্যথা ও বেদনা কোথায় এবং তাহার প্রতিকার কিরূপে সম্ভবপর তাহা তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দীন-দরিদ্র পরিব্রাজকরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ভ্রমনকালে ভারত-বর্ষের সমস্ত প্রদেশের নরনারীর চিন্তারাশীর সহিত সম্যক

পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য স্বামীজীর চিন্তাধারাকে ধ্যান করিলে মনে হয় ভারতবর্ষের প্রাণের সাড়া তাহাতে বিদ্যমান। স্বাধীন ঋষি যাহা-কিছু উন্নতির বন্ধনরূপে দেখিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। বন্ধন তাঁহার নিকট বৃশ্চিক-দংশন মনে হইত। তিনি জানিতেন মুক্তিই হইল সত্য, মুক্ত পথই মানব সমাজকে যাহা কিছু সুন্দর শোভন ও কল্যানকর, দান করিতে পারে। তিনি জানিতেন মুক্ত মানবই মুক্ত মানবকে সম্মান ও মর্য্যাদা দান করে। সেজন্য যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ স্বভাব অনুযায়ী উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য তিনি প্রার্থনা করিতেন।

স্বামীজীর চিন্তারাশির গভীরত্ব, ব্যাপকত্ব, ও মধুরত্ব জানিতে হইলে বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি সমূহের চিন্তাধারার সহিত পরিচয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তিনি সর্ব্বদেশই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তদুপরি নরনারীর সবলতা ও দুর্ব্বলতা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। মানুষকে চিনিবার ও জাতির জীবনের গভীরতম প্রদেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা দেখিবার দৃষ্টি তাঁহার অদ্ভুত ছিল। যখন নব্যভারত বলিতেছিল, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সবই ভাল, তখন স্বামীজী বলিলেন, "বালক চক্ষু চাহিয়া দেখ, পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় সাইলকের (Shylock) শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা ও পার্লিয়ামেণ্টের কথা শুনিতেছ সেগুলি বাজে কথা মাত্র। পাশ্চাত্য প্রদেশ শাইলকগণের (Shylock) অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত"। আবার প্রাচ্যের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "পুরোহিতের অত্যাচারে প্রাচ্যদেশ কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে।" পাশ্চাত্য জগৎকে তিনি বলিয়াছিলেন, "মানব জাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক।" তিনি দেখিয়াছিলেন উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মানুষ হয়ে' যাদের মানুষের জন্য প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?"

সাধারণতঃ স্বামীজীর জীবনী অধ্যয়ন করিলে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই—তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা। পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি স্বজাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন আত্মনির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে জীবের মঙ্গল হইতে পারে না। দুর্ব্বলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানবের আত্মমর্য্যাদা হয় না। সেইজন্য তিনি স্বজাতিকেই বলিয়াছিলেন, "হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় লালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না, পরমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়।"

তিনি জানিতেন নিজের উপর বিশ্বাস না হইলে কোন কাজই সম্ভবপর নয়। তিনি দেখিয়াছিলেন, জগতের প্রত্যেক জাতি নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির মুখ্য সহায় আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীল না হইলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। জগতের কোন নরনারীকে তিনি পরাধীনতায় জীবনযাপন করিতে পছন্দ করিতেন না। স্বামীজী বলিতেন, "ইংরাজ নরনারী অপেক্ষা আমরা কম বিশ্বাসী; সহস্রগুণ কম বিশ্বাসী। প্রভেদ এই ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা নহ।—সে বিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এই বিশ্বাস বলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও।"

দুর্ব্বলতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। নিজে বলিষ্ঠ ছিলেন,





সেইজন্য সমস্ত নরনারীকে তিনি সবলতার উপদেশ দিতেন। তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, আমরা অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য। এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না, আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিনজন একত্রে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ—দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছুই করিতে পারে না। আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে—ধর্ম্ম পরে আসিবে। তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক এক্ষণে লৌহ ও বজ্র-দৃঢ় পেশী ও স্নায়ু-সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেকদিন কাঁদিয়াছি, এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই। এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন ধর্ম্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এখন এমন সকল মতবাদের আবশ্যক যাহা আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয় এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। যাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর।"

স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারের মূল কারণ হইল জাতিকে বীর্য্যবান করা। তিনি জানিতেন একমাত্র বেদান্ত দ্বারা জাতিকে সবল করা যাইবে। বর্ত্তমানে ভক্তিবাদের দ্বারা এ দেশে কোন উপকার হইবে না। বেদান্তর দ্বারাই জাতি আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা পাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে, তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে।" সেইজন্য যাহাতে জাতি তেজস্বী হয়, বীর্য্যবান ও মেধাবান হয় তাহার চেষ্টা তিনি আমরণ করিয়া গিয়াছেন। জাতীকে এরূপ আশাপ্রদ বাণী বর্ত্তমান যুগে স্বামীজীর পূর্ব্বে কেহ শুনায় নাই। অদ্বৈতবাদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হইল জাতিকে, জগতের প্রত্যেক নরনারীকে সবল সতেজ করা। তাঁহার জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল যাহাতে প্রত্যেক জাতি সবল, বীর্য্যবান ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, "অতি শৈশবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে শিখুক, সাহসী সর্ব্বজয়ী ও সর্ব্বংসহ হউক।" যাহাতে মানবত্ব নষ্ট হয় স্বামীজী তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবত্ব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বামীজী নিজের জাতিকে কখনও গালি দেন নাই। তিনি জানিতেন গালিগালাজ বা নিন্দা করিয়া কোন সংস্কার করা যায় না। তিনি বলিতেন, "Denunciation is not the way to uplift a nation". কথাটি অতি সত্য। যাঁহারাই নিন্দাবাদের দ্বারা সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এগিয়ে যাওয়াই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি নিজে এগিয়ে যাইতে আনন্দ বোধ করিতেন ও জাতিকে এগিয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। অতীতের মোহে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন না। সম্মুখে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর বাণী—"পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না—এগিয়ে যাও সম্মুখে, সম্মুখে, একজন পড়িবে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে। আমি আমার জাতিকে বলি,—যাহা করিয়াছ বেশ করিয়াছ, আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর। আমরা একস্থানে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানেই বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। হয় আমাদিগকে সম্মুখে নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। এখন পশ্চাতে হাটিয়া গিয়া অবনত হওয়া—ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না। তাহা

কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।"

স্বামীজী ছিলেন বিরাট প্রতিভা-সম্পন্ন ঋষি, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ই আজকাল সকলে চর্চ্চা করিতেছেন। আজ যে অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে দেশময় আন্দোলন হইতেছে—সেই "দরিদ্র নারায়ণদের" জাগ্রত করিবার জন্য স্বামীজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের "দরিদ্রনারায়ণদের" জাগ্রত করিবার চেষ্টা স্বামীজীর পুস্তকাবলীতে ওতঃপ্রোতভাবে আছে। তিনিই প্রথমে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এই আন্দোলন আনয়ন করেন। 'দরিদ্র নারায়ণদিগকে' জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার স্থানে স্থানে মঠপ্রতিষ্ঠা। একবার জনৈক অন্যধর্ম্মী স্বামীজীর হাত হইতে প্রসাদ লইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী জাত যাবে না তো?" তদুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলে, "জাত যাবে কিরে ছোঁড়া? জাত হবে। তোদের কি কখনও জাত ছিল? এবার জাত হবে।"—সংক্ষেপে স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামীজী ছিলেন বর্ত্তমান ভারতের সবিতা। শ্রদ্ধেয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান ভারতের কুসংস্কার একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তাড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁকে অল্প বয়সেই হারিয়েছি।" বর্ত্তমান ভারতকে জাগরিত করিবার দু'টী মাত্র পন্থা স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন—ত্যাগ ও সেবা। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে ত্যাগ ও সেবার দ্বারা ভারত যত শীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, অন্য কোন উপায় দ্বারা তত শীঘ্র সম্ভবপর নয়। এই মহা দুর্দ্দিনে সমগ্র ভারতবাসী স্মরণ করুক সেই সবিতাকে যিনি আজও অজ্ঞাতে নব্যজাতির ধীশক্তি পরিচালিত করিতেছেন।

## নির্ব্বাসিতা

—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ

আমার জীবন-ভরা সকল পরশে
নিমেষ পরশ তব অনিন্দ্য-অতুল,
আমার নয়ন-হরা সকল দরশে
তুমি শুধু সত্য বন্ধু আর সব ভুল।

এ মোর মরম-ভরা স্বপ্নস্মৃতি-দলে
পরশ রতনখানি কোথা নিমগন,
তুমি উঠেছিলে জেগে প্রলয়ের জলে,
কমলা-সেবিত বিভু মঙ্গল লগন।

অনন্ত শয়ান তব, বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ
আমি শুধু নির্ব্বাসিতা জলধি-অতলে,
বুভুক্ষিত তনুমন, তৃষিত নয়ান,
ক্ষণ-মিলনের লাগি, ভাসি অশ্রুজলে।

## সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত

বাংলার পুণ্যময়ী নারী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলার নারী সমাজের উন্নতি কল্পে আপন প্রাণঢালা আগ্রহের সাহায্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া দেশের নারীদের উন্নতির যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা দেশবাসীর অন্তর হইতে মুছিয়া যাইবার নহে। তাই তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও স্বদেশবাসিগণ গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই সমিতি স্থাপন করেন। গত আট বৎসরে এই সমিতি যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। সমিতির উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যাপক বলিয়া ইহা হইতে দেশের নারী সমাজের, তথা সমগ্র দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সূচিত হইতেছে। সমিতির উদ্দেশ্য :—

১। বাংলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া উহার ভিতর দিয়া নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

'ঘুম' পার্ব্বত্য মহিলাদের মধ্যে সমিতি

সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করা।

২। কলিকাতায় একটী স্থায়ী নারী-মঙ্গল-সমিতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা—যাহা বিভিন্ন মহিলা-সমিতিগুলির কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উহাতে প্রাণের সঞ্চার করিবে ও উহাদের পরিচালনে সহয়তা করিবে।

৩। ঘরে ঘরে নারীদিগকে--বিশেষভাবে বিধবাদিগকে—গৃহ-শিল্পের শিক্ষাদান এবং তাঁহাদের প্রস্তুত জিনিষপত্র বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা।

৪। স্থানে স্থানে শিশুমঙ্গল-সমিতি ও ধাত্রী-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষিতা ধাইদিগকে মহিলা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা।

৫। কেন্দ্র সমিতির উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শিক্ষিত লোক দ্বারা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৬। মহিলা সমিতির ভিতর দিয়া দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সহায়তার জন্য বিনা বেতনে স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৭। বাংলা দেশের সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয় ও কলেজে যাহাতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং গৃহ-শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

৮। আবশ্যক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সহায়তা করা।

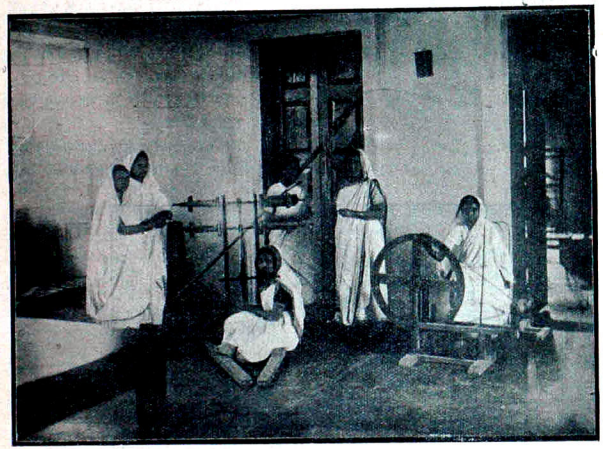

সরোজ নলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়ের একটী পাটের সূতাকাটার ক্লাস।

কলিকাতাস্থ সরোজনলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়ের একটী সূচি-শিল্পের ক্লাস।

৯। বাঙ্গলার সমস্ত হাঁসপাতালে "মাতৃ নিকেতন" (Maternity ward) খুলিতে সাহায্য করা।

১০। সমগ্র ভারতে নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা করা।

এইরূপ বিরাট এবং মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সমিতি ধীরে ধীরে দেশের সমগ্র মানব সমাজের অর্দ্ধেক অংশকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সামাজিক উন্নতিতে, আর্থিক স্বচ্ছলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের নিজেদের চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে, সমিতিবদ্ধ প্রণালীতে অসংখ্য মহিলা-সমিতি গঠন করিতেছেন।

এই আন্দোলন নারী-সমাজের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহারা জন সমাজে এবং নিজ নিজ সংসারের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেন্দ্র সমিতি বঙ্গনারীগণের জড়বৎ স্পন্দনবিহীন জীবনে একটা নূতন শক্তির চেতনা আনিয়া দিয়াছে। এই নূতন প্রেরণার প্রভাবে গার্হস্থানীতি, বিজ্ঞান স্বাস্থ্যতত্ত্ব কুটীরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই প্রকারে বাংলার নারী-জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক হিতসাধনের জন্য বহুকালের সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থানে অবরোধের পাষাণ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া তাঁহারা বিশ্বের জ্ঞান ও সভ্যতার সহিত সংযোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মহিলা-সমিতিগুলি পল্লীবাসিনী নারীগণের জীবনে একটা নূতন শক্তি, নূতন কর্ম্ম, নূতন আনন্দ আনিয়া দিয়াছে। জীবনকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে একটা ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা নিরানন্দময় পল্লীজীবন নবীন আনন্দালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, পাঠ, শিল্প ও শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পল্লীসমিতিগুলি প্রকৃতই জাতীয় জীবন গঠনের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে।

আমরা এই সমিতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করি ও প্রার্থনা করি যে, যেভাবে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এই ভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহারা দেশের ও দশের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

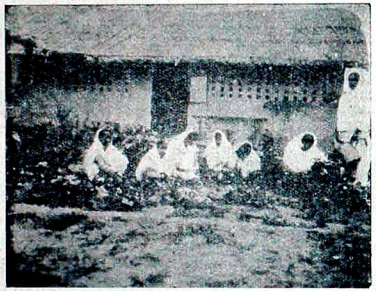

পুরী বিধবাশ্রমের মহিলাগণ বাগানের কাজ করিতেছেন।

আমরা সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি সম্পর্কীয় কয়েকখানি চিত্র প্রত্রস্থ করিলাম। পাঠকবর্গ তাহার মধ্য দিয়া সমিতির ও সমিতির কার্য্য প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

# রাশিয়ার আধুনিক নারী

জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আজ রাশিয়ার নারী পুরুষদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে এগিয়ে এসেছে। হাজার হাজার রুশ মেয়ে স্কুল কলেজে ঢুকে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করচে। এজন্যে তারা নারীর সহজাত সংস্কার কোমলতার সাধনাকে সর্ব্বথা পরিহার করেচে। রাশিয়ার নারীকে দেখে আজ

রুশীয় কৃষি-কলেজের ছাত্রিগণ হাতে-কলমে-শিক্ষার ক্লাসে চলিয়াছেন

আর তাদের কেউ "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব—" বল্‌বে না। জীবন-যাত্রার বন্ধুর পথে চল্‌তে গিয়ে পথের বাধার সঙ্গে যে সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের পালা চল্‌বে, তার ধাক্কা সইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে রাশিয়ার নারীকে দেহে এবং মনে কঠোরতা অর্জ্জন করতে হ'য়েচে।

সম্ভবতঃ এই জন্যেই রাশিয়ার নারীরা তাদের পশ্চিম-য়ুরোপীয় ভগিনীদের মত দৈহিক সৌকুমার্য্য লাভ করতে পারেনি। ইটালীয়ান্ মেয়েদের কৃষ্ণাভ কেশ-কলাপ, স্প্যানিশ্ রমণীর মনোহর আঁখি-পল্লব, অথবা জার্ম্মাণ-সুন্দরীর নীলোজ্জ্বল দৃষ্টি রাশিয়ার মেয়ের নেই। তারা তা পাবার সাধনাও করে না। অঙ্গরাগের ব্যবহার তারা ছেড়েচে। দেহকে রমণীয় ক'রে তোলবার জন্যে সুদৃশ্য নয়নাভিরাম পরিচ্ছদকে পর্য্যন্ত তারা পরিহার করেচে। কারণ জীবন-যাত্রার পথে এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর তাদের প্রগতির পথে বাধা-স্বরূপ।

অবশ্য এ যে তারা শুধু স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেচে তা' নয়, ত্যাগ করতে কতকটা বাধ্যও হ'য়েচে। কারণ কোন নারীর দেহে কোন রকম বিলাসোপকরণের পরিচয় পেলে ওখানকার গুপ্ত পুলিশ তৎক্ষণাৎ তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে এবং অনুসন্ধানে যদি প্রমাণ হয় যে তার স্বামী কম্যুনিষ্ট পার্টির অনুমোদিত উপায় ছাড়া অন্য উপায়ে অর্জ্জিত অর্থে এই বিলাসোপকরণ আহরণ করেছে তাহ'লে তার শাস্তি হবে। কাজেই মনের গোপন কোণে—নারী সুলভ বাসনাসক্তি লুকিয়ে থাক্‌লেও রাশিয়ার নারী সে আসক্তিকে নিষ্পেষিত করে ফেলতে বাধ্য হ'য়েচে। তবে এতে তারা মোটামুটি বিশেষ যে অসুখী তা নয়। বরং তাদের দেখলে মনে হয় যে তারা এ ব্যবস্থাকে খুব আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়েচে।

মোটের ওপর রাশিয়ার নারী আজ সব দিক দিয়ে তার কল্পিত আভিজাত্যকে বর্জ্জন করেচে। আজ রাশিয়ার বাজারে একজন গ্র্যাণ্ড্ ডাচেস্‌কে অপর পাঁচজন সাধারণ

সম্ভ্রান্ত মহিলারাও ক্ষেতের কাজে চলিয়াছেন

মেয়ের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে টুপী বিক্রী করতে দেখতে পাওয়া আদৌ একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়।

শুধু তাই নয় রাশিয়ার নারী আজ অবলীলাক্রমে দলে দলে গিয়ে সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করতেও একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। সেখানে গিয়ে তারা খুব সহজ ভাবেই 'মেশিন্ গান' এবং রাইফল্-এর ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা করে! রাশিয়ার নারী আজ কল-কারখানায় যন্ত্রপাতির ব্যবহারেও পুরুষদের সঙ্গে সমানে পাল্লাদিতে ইতস্ততঃ করেনি। তাছাড়া সভাসমিতিতে, জাতীয় আন্দোলনে, মন্ত্রণা-সভায়, বিচারালয়ে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই রাশিয়ার রমণীকুল এমনভাবে পুরুষদের সঙ্গে নিজেদের সমকক্ষতা প্রমাণ করেচেন যে রাশিয়ায় আজ আর পুরুষদের পক্ষে chivalry দেখাবার কিছুমাত্রও অবকাশ নেই। এমনকি রাশিয়ার আইন যৌন-সম্পর্কেও নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হ'য়েচে।

স্বাবলম্বিনী বৃদ্ধা
সূতাকাটা ও কাপড় বোনায় এই বয়সেও কৃতিত্ব দেখাইতেছেন





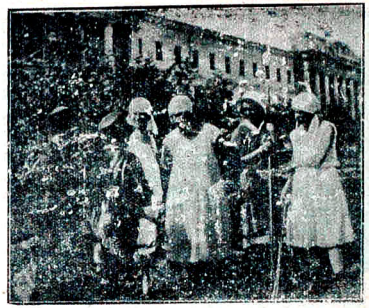

নারী ভলান্টিয়ার বিদেশের নবাগতদিগকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইতেছেন

বর্ত্তমানে রাশিয়ার সমাজে নরনারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া যেমন অনায়াস সাধ্য সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াও তেমনি সহজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ ইচ্ছে করলে অপরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে—কেবলমাত্র তাদের বিবাহ যদি রেজেষ্ট্রীকৃত হয় তা'হলে একবার গিয়ে সরকারী রেজেষ্ট্রী বই থেকে তাদের নামটুকু খারিজ করিয়ে এলেই হোল। ওখানে বর্ত্তমানে রেজেষ্ট্রী না করেও বিবাহ চল্‌তে পারে। মোটকথা একজন পুরুষ ও একজন নারী উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হ'য়ে একত্রে অবস্থান করলেই তাদেরকে বিবাহিত ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। মস্কোর এক হোটেলের নারী-ম্যানেজার সেদিন জনৈক বিশিষ্ট বিদেশী লোকের কাছে গর্ব্বের সঙ্গে বলছিলেন যে আমি গত দু'মাসের মধ্যে আঠারো জন ভদ্রলোককে পর পর পতিত্বে বরণ করেছিলুম কিন্তু তাঁরা কেউ আমার মনের মতো না হওয়ায় আমি সকলকেই ত্যাগ করেছি!

দেখে শুনে মনে হয়—রাশিয়ার নারী বর্ত্তমানে যেন যৌন-বিষয়ে তাদের এই স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার

নেতৃস্থানীয়া গ্রাম্য মহিলা

সৈন্য বিভাগের মহিলাগণ রাইফেল ও মেসিনগান পরীক্ষা করিতেছেন

জন্যই এই মত্ততার অভিনয় করচে! মনে হয় রাশিয়ার নারী আজ যেন সহসা বাঁধভাঙ্গা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত উন্মত্ত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক দুর্ব্বার স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের মাঝে—সেখানে সে তার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ পর্য্যন্ত ভেবে দেখতে নারাজ! আর তার এ ব্যাপার ওখানকার আইনও অনুমোদন করেচে।

---

## শরতের চাঁদ

—মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

শরতের চাঁদ নীল গগন কোণে
সেথা হতে পাতে ফাঁদ এ মোর মনে—
সাগর আপন বুকে
ছবি তার আঁকে সুখে
মিলনের আশে তার, প্রহর গোণে—
কল্পনা মায়াজাল কী মোহ বোনে!

ওরূপে পাগল হোল সারা ধরণী—
বাঁশরীতে মোহজাল বিস্মরণী!
সেযে সুদূরের ধন
যত তারে চাহে মন
পাইবার নহে সেই পরশমণি—
এই বাণী বার বার উঠিছে ধ্বনি'!

---

# "ভালো লাগা"

(গল্প)

—শ্রীমতী আশালতা দেবী

পূর্ব্ববঙ্গের মাঝারি জমিদার রায়েরা বনিয়াদি বংশের বড় লোক। সাবেকি চাল চলন। তবে যেমন হইয়া থাকে, পূর্ব্বে কর্ত্তাদের আমলে ঠিক যেমনটি ছিল তেমন আর নাই। শিক্ষা এবং সভ্যতার ধারা বদলাইয়া গেছে। সর্ব্বত্রই ভাঙ্গনের ঢেউ আসিয়া লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গের সুদূরতম এক নিভৃত কোনেও তাহার ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহাদের চাল চলন, ধরন ধারণে সাবেকি কাঠামোটা এখন বজায় আছে বটে কিন্তু হাল আমলের চাঞ্চল্য তাহারই ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ফাটল ধরাইয়াছে। আর তাহাই যদি না হইবে তবে কিছুদিন পূর্ব্বে যে পরিবারের পুরুষেরা যে কোন পরপ্রয়োজনেও আপনাদের জমিদারীর গণ্ডীটুকু ছাড়াইয়া এইটুকু বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। সেই পরিবারের ছেলে সুধাংশু বি-এ তে সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া সমুদ্র পারাপার করিয়া একেবারে বিলাত অবধি ঘুরিয়া আসিল কী প্রকারে! কালে সবই হয়।

কিন্তু গল্পটা গোড়া হইতে বলা যাক :—

সুধাংশু ও সিতাংশু দুই ভাই। তাহারা রায়েদের জমিদারীর সাত আনার সরিক। তাহাদের নাবালক অবস্থাতেই বাবা মারা যান। কিন্তু সেজন্য কোন ক্ষতি বা কোন অভাব একটা দিনের জন্যও তাহারা অনুভব করে নাই। সুধাংশুর বাবা নবকান্তবাবু যখন অল্পবয়সেই মারা গেলেন তখন অনেকেই আঁচ করিয়াছিল, এইত সবে দুইটি ছোট ছোট ছেলে, তাহাদের মাথায় হাত দিয়া নয় আনার অংশীদার বড়বাবু এইবারে জাঁকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু নবকান্তের বিধবা তারাসুন্দরী জমিদার ঘরের মেয়ে, জমিদার ঘরের ঘরণী এবং পুত্রবধূ, এবং তাঁহার মামার বাড়ীও বড় জমিদারবংশ। আশৈশব তিনি যে আবেষ্টনী এবং আবহাওয়ায় মানুষ তাহারই সহিত তাঁহার প্রখর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মিলিয়া তাঁহাকে এমন উপযুক্ত করিয়াছিল যে স্বামীর মৃত্যুর পরেও কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া বিষয় সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

বড় ছেলে সুধাংশু মায়ের মত বুদ্ধিমান এবং স্বাধীনচেতা ছিল। তাহার চরিত্রে একটি দৃঢ়তা এবং সকল বিষয়ে নিজের মতামতের বিশিষ্টতা ছোট হইতেই দেখা দিয়াছিল। গাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ হইলে সে জিদ করিয়া কলিকাতায় গেল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অবধি পাশ করিল। তারাসুন্দরী অপর সকল আত্মীয়স্বজনের গলাফাটাইয়া কলকোলাহলের মাঝে দু'একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়াছিলেন বটে যে, "কর্ত্তারা কেহই ত বিদেশ যান নাই, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁহারা ত কাহারো চেয়েই খাট ছিলেন না।" অথচ মনে মনে তিনি ছেলের মতের সঙ্গেই সায় দিয়া বলিতেন, "পুরুষের জ্ঞানের সীমা, উদ্যোগের পর্য্যায় যতই সীমা ছাড়ায় ততই ভালো।"

কিন্তু সুধাংশুও সত্যসত্যই সীমা ছাড়াইতে লাগিল। প্রেসিডেন্সিতে বি-এতে সরকারী বৃত্তি পাইয়া জ্ঞানের সাধনাকে আরও দীর্ঘতর আরও বিস্তৃত করিয়া লইতে সে বিলাত গেল। বিলাত যাওয়ায় তারাসুন্দরীর মত ছিল না। তবুও এই বলিয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা দিলেন, ছেলে ত সখ করিয়া যায় নাই, গিয়াছে জ্ঞানের জন্য। ফিরিয়া আসিলেই একটা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়া বিবাহ দিবেন। যাহাতে ঘরের প্রতি মন বসে চতুর্দ্দিক হইতে সেই আয়োজন করিয়া লইবেন। একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যে আবার ছেলেকে

ঘরে তুলিয়া লওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক স্মার্ত্তপণ্ডিতদের সহিত তিনি কিছু কিছু আলোচনাও করিয়াছেন।

কিন্তু ঘরের ছেলে তাহা শুনিল না। সমাজের দাঁড়ে "যেন একখানি পোষমানা প্রাণ" রূপে শান্তশিষ্টভাবে নিরুপদ্রবে নিয়মানুবর্ত্তিতায় আগাগোড়া ঢাকা দিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারিল না। সুধাংশু যে স্বভাবে, হৃদয়-বৃত্তিতে চেহারায় একেবারে তাহার মায়েরই প্রতিরূপ। তারাসুন্দরী যৌবনকালে বিধবা হইয়াই যে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেন নাই, হাল ছাড়িয়া দিয়া লুটাইয়া পড়েন নাই। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত বৈরাগ্য মাখানো উৎসাদিত অতুল সুন্দর রূপ লইয়া চোখের জল মুছিয়া তখনই আবার উঠিয়া বসিয়াছিলেন এবং শিশুপুত্র দু'টির মুখের দিকে তাকাইয়া আবার আসিয়া-পড়া অবাধ্য অশ্রুকে প্রাণপণবলে সংবরণ করিয়া চিকের আড়াল হইতে দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বিষয়-পত্র বুঝিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে রায়পরিবারের অপরাপর কুলমহিলারা অবাক হইয়া মুখ চাওয়াচায়ি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা মতে সদ্য-বিধবা মুখে মুখে ছড়া কাটিয়া অন্ততঃ একমাসকাল অশ্রান্ত রোদনবেগে সারা পল্লী সচকিত করিয়া রাখিবেন। এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পরিবার শুদ্ধ সকলে হিম সিম খাইবার জো হইবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। তারাসুন্দরী সেই যে রোদন-স্তম্ভিত মুখে নিঃশব্দ কল্পনাতীত ধৈর্য্যে আপনার হাতে তাঁহার বিধ্বস্ত সংসারের সমস্ত ভারই তুলিয়া লইলেন সেই হইতে আজ অবধি তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই।

রায়পরিবারের মেয়েদের মাঝে তারাসুন্দরী ছিলেন অসাধারণ ব্যতিক্রম, এখন আবার তাঁহারই বড় ছেলে সুধাংশু পুরুষ সমাজের মাঝে ততোধিক চাঞ্চল্যের আলোড়ন তুলিল। এবং তাহাই লইয়া সেই বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠির শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ, অসংখ্য সরিকদল ও ততোধিক সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ তাঁহাদের মোসাহেবের দল আলোচনা করিতে এবং নিন্দা করিতেও কিছু বাকী রাখিল না। কিন্তু এ সবই তারাসুন্দরী নিঃশব্দে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং এতদূর অবধি করিয়াও ছিলেন। অবশেষে সহ্য করা চলিল না, কারণ সুধাংশুর অসম সাহসিক কাণ্ডকারখানা ক্রমশঃ নির্লজ্জগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। এইবার কিরূপে এবং কিপ্রকারে তাহার মায়ের সহিত তাহার বিচ্ছেদ মর্ম্মভেদী হইয়া উঠিল তাহারই কারণগুলা জানাই।

( ২ )

শ্রাবন মাসের শেষের দিকে সুধাংশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আসিয়া কলিকাতার একটী ইংরেজী-ঘেঁষা হোটেলে উঠিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে একরাশি ডিগ্রী। কোন-একটা বড়দরের কলেজে তাহার বিজ্ঞানের প্রফেসরের পদও পাকা হইয়া গেছে। তাহার মা কলিকাতায় থাকায় কিছুই বলেন নাই। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন সামনের ভাদ্র মাসটা পার হইয়া গেলেই যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আছেন সকলকে আনাইয়া দেশের বৃহৎ বাটীতে তেমনি ধুমধামে সুধাংশুর প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের যোগাড় করিবেন। তাহার পরে……তাহার পরে সুধাংশু আসিয়া মায়ের হাত হইতে সমস্ত ভার তুলিয়া লইবে। চাকরি?……চাকরি করার প্রয়োজন কি, যখন তাহার ঐশ্বর্য্য কে দেখে তাহার ঠিক নাই। তবে ছেলের যদি চাকরি করিবার সখ হইয়া থাকে এই দুই মাস করিয়া নিক।

এতদিন পরে নানালোকের নিন্দা পরিবাদ সহ্য করিবার পরে তারাসুন্দরীর মন সুনির্ম্মল আকাশের মত উদার আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। ছেলে কতদিন পরে সুদূর বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যেমন-তেমন আসা নয়, কীর্ত্তিতে, বিদ্যায়, যশে মণ্ডিত হইয়া ফিরিয়াছে। এখন কেবল তাহার ধুলা মাটি ঝাড়িয়া তাহাকে ঘরে লইবার অপেক্ষা। তারাসুন্দরী যতই বুদ্ধিমতী হউন আধুনিক ছিলেন না। সুধাংশুর এই যে কলেজে পড়িবার জন্য প্রবল জিদ, বিদেশের নব-নব জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনুসন্ধিৎসু চিত্তকে নিয়ত নিয়োজিত করিয়া





রাখিবার কামনা এ সকলই তাঁহার কাছে পুরুষের একটা খেয়ালের মধ্যে ছিল। খেয়াল এবং খেলা করা ছাড়া ইহারও যে আবার একটা গভীর উদ্দেশ্য, প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে—যে আকাঙ্ক্ষা জীবন-মূলের ভিত্তিকে যাইয়া স্পর্শ করিয়াছে সে ধারণা তিনি মনেই আনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন কর্ত্তারা যেমন একদিকে দশটার মধ্যে পোলাও-পরমান্ন খাইতে না পাইলে ক্রোধে এবং ক্ষুধাতে দশদিক আচ্ছন্ন দেখিতেন এবং তবুও মাঝে মাঝে যখন সখ করিয়া শীকারে যাইতেন তখন মাথার উপর চড়া রোদ লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া তাহাতেই সারাবেলা মাতিয়া থাকিতেন; সুধাংশুর এই অগাধ সচ্ছলতার মাঝেও কষ্ট করিয়া সাতসমুদ্র পারে বিদেশে গিয়া লেখাপড়া শেখাও তেমনি একটা সখ। পুরুষে আপন সখের জন্য মাঝে মাঝে আদর ও আরামের নিয়ম ভাঙ্গিয়াই সুখ পায়। কিন্তু সেটাও কিছু আর চিরদিনের নয়। এই কয়েক দিন হইতে মন তাঁহার বসন্ত বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সুধাংশু বিলাত যাওয়ার পর হইতে চিরশত্রু পাশের গ্রামের জমিদার বসুরা নানাছলে তাহার নিন্দা করিয়া ফিরিতেছিল। আসলে বসুদের একমাত্র বংশধরকে মাত্র উনিশ বছর বয়সেই বিবাহ দিয়া এবং তাগাতাবিজ ও বশীকরণের নানা মন্ত্রে আচ্ছন্ন করিয়াও তাহাকে তাহার অভিভাবকগর্গ মানুষ হইবার পথে রাখিতে পারেন নাই। তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার অসংযম নিরন্তর পশুত্বের কোঠায় নামিয়া চলিয়াছিল। তাই মানবমনের চিরন্তন প্রতিক্রিয়া বশতঃ নিজের ছেলেটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পরের ভালো ছেলেটির প্রতি তাহাদের বরাবর আক্রোশ ছিল। কিন্তু কাল সেই বসুপরিবারের গিন্নী হঠাৎ বিনা আমন্ত্রণে ষোলকাহারের পাল্কীতে করিয়া আসিয়া হাজির। আসিয়া তারাসুন্দরী প্রদত্ত মখমলের মছলন্দে বসিয়া সোনার ডিবা হইতে পান একটা বাহির করিয়া খাইতে খাইতে একথা সেকথার পর, কর্ত্তার অম্বলের অসুখটা এবার কিরূপ বাড়িয়াছে, বৌমার জন্য এই পূজাতে কিরূপ জড়োয়ার তাবিজ গড়িতে দিয়াছেন এই সকল গল্পের সহিত মিশাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সুধাংশু একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হেমাঙ্গিনীর সহিত (তাঁহার একমাত্র কন্যা) তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করেন। বসুপরিবার কুলমর্য্যাদায় রায়েদের চেয়ে অনেক উপরে এবং এতদিন ধরিয়া প্রাণপণে রায়েদের সহিত রেষা-রেষি করিয়া আসিয়াছে আর আজ হঠাৎ সেই দাম্ভিক পরিবারের গৃহিণীকে নিজে হইতে যাচিয়া কন্যাদানের প্রস্তাব করিতে দেখিয়া তারাসুন্দরীর মাতৃ-হৃদয় পুত্র গর্ব্বে আরও স্ফীত হইয়া উঠিল।

সেবারে আশ্বিনের প্রথমের দিকেই পূজা। প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া তিনি সুধাংশুকে তাহা জানাইয়া বাড়ী আসিতে পত্র লিখিলেন। আকাশে বাতাসে তখন আগামী পূজার আনন্দ ও মাদকতা। আশ্বিনের নির্ম্মল আকাশে বৃষ্টিরিক্ত শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ইতস্তত ভাসিতেছে, তারাসুন্দরীও তেমনি আনন্দময় লঘু পদক্ষেপে পূজার যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। শরতের অবারিত নীল আকাশে যেন আনন্দের একখানি অদৃশ্য সূক্ষ্মজাল অবিরত বোনা হইয়া চলিতেছে।

তারাসুন্দরী সকালে উঠিয়া ঘরদ্বার ঝাড়িয়া দুয়ারে সিন্দুর দিয়া পূজার মঙ্গল কর্ম্ম সমস্ত শেষ করিয়া রাখিতেছিলেন এমন সময় সুধাংশুর নিকট হইতে চিঠির জবাব আসিল। সে লিখিয়াছে, "আমি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলাম এবং তাহাই শিখিয়াছি, এমন কোন পাপ কাজ করি নাই যাহার জন্য মা দেশশুদ্ধ লোক জড়ো করিয়া সকলের সামনে আমাকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন। পাপ যখন করি নাই তখন প্রায়শ্চিত্তও করিব না। সে বিষয়ে মায়ের কোন অনুরোধই শুনিব না। আর চাকরি করা বিষয়ে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। অর্থের জন্য আমি চাকরি করি নাই, বিজ্ঞানের যে বিষয়ে এতবৎসর ধরিয়া পড়াশোনা করিয়াছি, তাহারই অধ্যাপক হইয়া সেই বিষয়ের সহিত যুক্ত থাকিব, সেই বিষয়ে নিজের জ্ঞানকে আরও বিস্তৃত করিয়া লইব এই আমার কামনা। অতএব চাকরি ছাড়িয়া দিয়া দেওয়ান আর গোমস্তার নিকট জমিদারির আদায়, তহশীল বাকীবকেয়া, সেস, রেভিনিউ ইত্যাদি পরম অরুচিকর বিষয়ের

দিস্তা দিস্তা কাগজ দেখিয়া আমি কিছুতেই দিন কাটাইতে পারিব না। তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিবাহের সম্বন্ধেও কাহারো মতে বা কোন সুবিধার বশবর্ত্তী হইয়া আমি চলিতে পারিব না। যাহাকে আমার মনে লাগিবে তাহাকেই বিবাহ করিব।"

চিঠি পড়িয়া অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত হাতের তুলি এবং সিন্দুরের পাত্র রাখিয়া তারাসুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিবেশিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুরোর মা, তুমি এই বাকীটুকু শেষ করিয়া ফেল দেখি বাছা। আমার কাজ আছে আমি উঠি।" শয়ন-কক্ষের দ্বার পড়িল এবং সেই রুদ্ধ গৃহের ভিতর চিঠি হাতে তারাসুন্দরী কি করিতেছেন কিছুই বোঝা গেল না।

( ৩ )

তাহার পর অনেকদিন চলিয়া গেছে সুধাংশু দেশে আসিয়া বসবাস করিতে সম্মত হয় নাই। সে কলিকাতাতে থাকে। বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার খ্যাতি ও পদবী আরও বাড়িয়াছে। লেখাপড়া না জান মেয়েকে সে বিবাহ করিবে না পণ করিয়াছিল, সে পণও ভাঙ্গে নাই। তাহাদের কলেজের সিনিয়র প্রফেসর কেদার গুহের মেয়ে ছায়া দেবী—যিনি বি-এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছে। দেশের বাড়ীতে সুধাংশুর কথা প্রায় কেহ বলে না তারাসুন্দরীর ভয়ে। তারাসুন্দরী ছোট ছেলে সীতাংশুর গরীবের ঘরের একটি মেয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। মেয়েটি সুন্দরী একথা যদি বা লোকে স্বীকার করিতে না চায় সে যে শান্ত এবং সুলক্ষণা তাহা সকলেই বলিবে। তরুণী বধূ নতনয়না, সলজ্জকুণ্ঠিতা। সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ির পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে। অনেকদিন পরে আবার শরতকাল আসিয়াছে, পূজা আসন্ন। নীল আকাশের দিকে চাহিয়া প্রবাসী প্রিয়জনের কথা স্মরণ হইয়া যায়। নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও তারাসুন্দরীর নূতন করিয়া মনে পড়িয়া যাইতেছে সুধাংশু এখানে নাই।

সুধাংশু এখানে নাই, কিন্তু সুধাংশু এখন কোথায়? তাহার জীবনের একাংশের পর্দ্দা তুলিয়া দেখা গেল একটি সন্ধ্যার দৃশ্য :—

কলিকাতায় ভবানীপুরের অপেক্ষাকৃত জনবিরল দিকে একটি সুদৃশ্য বাড়ীর দোতালায় লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকেও সুধাংশু ঝুকিয়া পড়িয়া বই পড়িতেছিল। উপস্থিত ঘরে কেহ নাই। মিনিট পনের পরে একটি মেয়ে, বাইশ তেইশ বছরের সুন্দরী তরুণী, ঘরে ঢুকিল। আলোর সুইচটা টিপিয়া দিয়া কহিল, "বই পড়ায় এত তন্ময় যে আলোটা আলিয়ে নেবার কথাও মনে নেই? নির্ম্মল তাই এখনই আমায় বলছিল বইয়ে পড়া ছাড়া নিজের চোখে দুনিয়াটাকে তুমি কোন দিন উপভোগ করতে শিখলে না।... কিন্তু নির্ম্মল তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো? ঘরে এসে বসো।"

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক স্লীপ্‌লেস চশমা পরা, ঢিলা পাঞ্জাবীর হাতা এবং বারান্স ইঞ্চির মলমলে ধুতি পরনে ঘরে ঢুকিল। অদূরবর্ত্তী সোফায় যাইয়া বসিল। সুধাংশু একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আমাকে তোমরা এমনই মনে কর, নয় নির্ম্মল? হবেও বা হয় ত। জ্ঞানের জন্য জীবনে অনেক কিছু ছেড়েছি। কিন্তু তার বদলে কি পেয়েছি সেটাও এক এক সময় ভাবি।"

ছায়া ওপাশের আয়নার নামনে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ তাহার মাথার সোনার ক্লিপটা ঠিক করিয়া আঁটিয়া লইতেছিল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কী ছেড়েচ শুনি? তোমাদের সেই পচা পাড়াগাঁয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসার মতন আবদ্ধ জীবন, আর বনগাঁয়ের বুনো বাবু হয়ে থেকে কতকগুলো অশিক্ষিত দেওয়ান আর গোমস্তার উপর সর্দ্দারি করে বেড়ানো, বলি ছাড়ার বহরটা এই ত?"

সুধাংশু অন্যমনস্ক হইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তা-ই। আমিও এক সময় তোমার মত করে ভাবতুম ছায়া। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হয় হয় ত.....।" তাহার





কথায় বাধা পড়িল, বাহির পিয়ন হাকিল, "বাবু একঠো তার হ্যায়!"

তিনজনেই চম ইয়া উঠিল। আয়নার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া ছায়া ভয় পাইয়া বলিল, "এমন অসময়ে তার কেন?"

নির্ম্মল সাহস দিয়া কহিল, "তারের আর সময় অসময় কি, হয়ত কোন জরুরী খবর আছে।" সুধাংশু শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "নির্ম্মল তুমিই উঠে যাও না, আমার হয়ে সাইন করে নিয়ে এস। খুলে দেখ।"

"আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?".....নির্ম্মল উঠিল, "হয়ত কিছুই নেই, হয়ত কোন একটা জরুরী খবর মাত্র।"

টেলিগ্রাম খুলিয়া কিন্তু নির্ম্মলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল, 'আপনিই পড়ুন।' টেলিগ্রাম করিয়াছে সিতাংশুভূষণ রায়। তাহাদের মা তারাসুন্দরী হঠাৎ হার্টফেল হইয়া মারা গিয়াছেন। নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ছায়া ভয়ে ভয়ে সবারই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সুধাংশুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখ পাথরের মত নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক, ভাবলেশহীন। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুধাংশু উঠিয়া তাহার শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। মনে কোন একটা ভয়ানক আকস্মিক বেদনা পাইলে তাহার মা তারাসুন্দরীও এইরূপ করিতেন।

* *

সিতাংশু আসিয়া জোর করিয়া ধরিয়া দাদা ও বৌদিকে কয়েক দিনের জন্য দেশে লইয়া গেল। ট্রেনে যাইতে যাইতে কহিল, "মা বলতেন আমি বেঁচে থাকতে সুধাংশু এখানে আসে না, আমি মারা গেলে হয়ত আসবে। তুমি যে দাদা শেষেরদিকে বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে।"

ছায়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল 'না ছেড়ে দিয়েই বা কি করেন বল ঠাকুরপো। যা ম্যালেরিয়া! একবার গেলেই ধরিয়ে আসতে হবে। তাইত পাড়াগাঁ দেখবার সখ থাকলেও বিয়ের পরে একটা দিনের জন্যেও আমার ওখানে যেতে সাহস হয়নি।'

সুধাংশু কিন্তু এসকল কথা শুনিতেছিল না। সিতাংশুর শেষের কথাটা তখনও তাহার মনে ঘা দিতেছিল। তাহাদের অতবড় সংযমী, অবিচলিত ধৈর্য্যময়ী মায়ের মুখ দিয়া কতদিনের কত আত্মযুদ্ধের পর যে স্নেহে এবং অভিমানে বিজরিত অমন মর্ম্মান্তিক কথা বাহির হউয়াছে তাহাই অকস্মাৎ উপলব্ধি করিয়া সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইতে ট্রেণের জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

( ৪ )

ছায়া কবির কাব্যে নানাস্থানে পল্লীগ্রামের বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল দেশে আসিয়া দিনকতক তাহার কবিত্বময় আবেষ্টনীতে কাটিবে। কিছুদিন বেশ মজা লাগিবে। কিন্তু সে মজা নিরবচ্ছিন্ন মজা, তাহার ভিতর শ্বশুর পরিবারের এতটুকু সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধার ভাব নাই। তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্বশুরবাড়ীতে নামিয়া দেখিল সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকার সমস্তটাই নানা বয়সের নানা আত্মীয় স্বজন, তাঁহাদের পরিবারবর্গ এবং আশ্রিতদের দ্বারা পরিপূর্ণ। সিতাংশুর স্ত্রীর অল্প বয়স। বয়সে সে ছায়ার চেয়ে দুই তিন বছরের ছোটই হইবে। এতদিন অবধি ছোট বা সবিতাকে ছায়া একদিনের জন্যও চোখে দেখে নাই, কিন্তু সেই একেবারে অজানা অপরিচিত মেয়েটা ছায়া গাড়ী হইতে নামিবামাত্র যখন একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া "দিদি" বলিয়া ডাকিল তখন সে অবাক হইয়া ভাবিল, বোধ করি ইহাই তাহাদের পাড়াগাঁয়ের সভ্যতার রীতি। কিন্তু সবিতা কেবল দিদি বলিয়া ডাকিয়াই ক্ষান্ত হইল না সর্ব্বদাই এমনভাবে চলিতে লাগিল যেন তাহার স্নেহময়ী দিদি কতদিন পর দূর দেশ হইতে দু'দিনের জন্য ছোট বোনের কাছে আসিয়াছেন। এবং কর্ম্মবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ বৃহৎ সংসারের উদ্বাস্ত

পরিশ্রমের মাঝেও সর্ব্বদাই দৃষ্টি তাহার ছায়ার এতটুকু সুখ সুবিধার দিকে জাগ্রত হইয়া রহিল। প্রথম দিনের কথাটা ছায়ার মনে পড়ে। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে সে আসিয়াছিল। গাড়ীর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পরের দিন একটু বেলা করিয়া যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল বাহিরের বারান্দায় বা'র হইয়া আসিতেই সবিতা কহিল, "বাবা, দিদির কী ঘুম! যেন কুম্ভকর্ণ! আমি তিনবার তোমার চা তৈরী করেচি তিনবার ফেলে দিয়েচি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে।"

সবিতাদের কলিকাতার সমাজে শিষ্টাচারের ঠিক এইরূপ রীতি নহে। তথাপি সদা হাস্যময়ী যেন আনন্দের প্রতিমা এই মেয়েটির উপর সে কিছুতেই রাগও করিতে পারে নাই। নিজেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল 'তাই বুঝি? কিন্তু আমার জন্য তোমার এত কষ্ট করা কেন? তোমাদের বাড়ীতে ঝি কিংবা বেয়ারা কি নাই? তাহাদের বলিলেই ত চা'টা করিয়া দিতে পারে।'

তাহার প্রত্যুত্তরে সবিতা অভিমান করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন আবার! তোমার চা আমি করতে দোব ঝিকে?—আর তাই করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব! দিদি যে কী বলে! তুমি আমার দিদি না তাদের দিদি?'

ছায়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া ভাবিতেছিল, এ কথার সমীচীন উত্তর কি দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সবিতা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কিন্তু আমার মাথা খাও দিদি শুধু চাটুকু খেয়ে চান আহ্নিকের অছিলা করে খাবারের থালাটা যেন ঠেলে দেবনা।"

স্নান আহ্নিক না করিয়া কিছু খায়না এমন কুসংস্কার ছায়া কোন কালে মানে না। বস্তুতঃ এ সব ঝঞ্ঝাট তাহার কোন কালে নাই। কিন্তু তাহার চেয়েও অল্প বয়সের এই যে মেয়েটি শ্রাদ্ধবাড়ীর সুবিপুল কর্ম্মভারের মধ্যে অহোরাত্রি নিমজ্জিত থাকিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের আগে প্রায় কোনদিনই জল গ্রহণ করে না আজ তাহারই কাছে এই কথাটা স্বীকার করিতে প্রথম যেন সে লজ্জা পাইল।

বলিল, "আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন বল দেখি।"

সবিতা যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, 'তোমার জন্যে আমার ভাবনা হবে না ত কার হবে বল দেখি? সে কি ও পাড়াব রামের মার হবে? একেই ত কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে তোমার এমনিতে কত অনিয়ম হচ্ছে তার উপর সাধ করে আর অনিয়ম করোনা দিদি। অসুখ বিসুখ একটা কিছু হলে তখন সেই আমাকেই ত ভুগে মরতে হবে।' বলিতে বলিতে উচ্ছিষ্ট চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'আমি একটু চট করে ঘুরে আসি ভাই। দু'দণ্ড যে তোমার কাছে বসব সে উপায়ও নাই। রাজ্যের কাজ। কিন্তু ফিরে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাবারের থালাটা শেষ হয়ে গেছে।

ছায়া, সবিতার গমনোন্মত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সহিত সবিতার ক'টা-দিনেরইবা দেখা শোনা, সবে কালই ত সে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এই একটা রাত্রির ব্যবধানেই তাহাকে এমন করিয়া আপন করিয়া লইতে এই মেয়েটির কোথাও ত এতটুকু বাধিল না। তাহার ভালো থাকার জন্য তাহার একটুখানি সুখ সুবিধার জন্য ইহার এই অকৃত্রিম উদ্বেগ এবং ভাবনা এ বস্তুইবা সম্ভব হইল কী করিয়া! পাড়াগাঁয়ের এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটি এমন শক্তি পাইল কোথা হইতে?

* * *

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেছে। সুধাংশুর চাকরীর ছুটিও ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাইবার জন্য সে তাগিদ দিতেছে, কিন্তু অন্তঃপুরে ছায়ার নিকট তাহা না-মঞ্জুর হইয়া যাইতেছে। অথচ এই ছায়াই আসিবার সময় বলিয়াছিল, 'ঠাকুরপো, তুমি জিদ করে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছ বটে কিন্তু আমি বেশ জানি থাওনে আমি দুটো দিনও থাকতে পারব না। হয়ত বা নেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়বে।" কিন্তু নিজের প্রায় অজ্ঞাতেই এখানে, এই অবাঞ্ছিত স্থানে সে এমন একটা রস পাইয়াছে যে তাহা ছাড়িয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিতে তার মন উঠিতেছিল না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে সবিতার





শরীর খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার নিত্য-কর্ত্তব্যের এতটুকু বিরাম নাই। এতবড় সংসারটীকে সে যেন আপনার হৃদয়ের স্নিগ্ধ ছায়ায় সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ছায়া একদিন বাধা দিয়া বলিল, 'শরীর খারাপের উপরেও কাজ করে নাকি?'

সবিতার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল, "দিদি, মা যে তাঁর সংসারের ভার আর তার সমস্ত কাজের ভার আমার উপরেই দিয়ে গেছেন। কাজ না করে কি করে থাকি বল? বরঞ্চ আমার মাঝে মাঝে একটা ভয়ের মত হয়, আমি কি তা পারব?···আমি কি তা পারছি তাঁর মত করে? এমনিতেই আমার কত ভয়, তিনি এখন নেই, কিন্তু তাঁর মত করে কি করে আমি সমস্ত চালিয়ে নেব।"

ছায়ার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। নিজের মায়ের সহিত সম্বন্ধও তাহাদের সমাজে কৃত্রিম, তাহা শিষ্টাচারের সম্বন্ধ, স্বার্থের সম্বন্ধ। যতক্ষণ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বার্থের সহিত সংঘাত না লাগে ততক্ষণই তাহা মিহি এবং নরম থাকে। কিন্তু নিজের মায়ের কথা যাহাই হৌক পরের মাকেও যে কিরূপে এমনভাবে জীবনের মাঝে জড়িত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধকে স্নেহে বিস্ফারিত, ভক্তিতে উজ্জ্বল এবং তাঁহারই বংশমর্য্যাদায় নিজেকে মহিমান্বিত মনে করিয়া গর্ব্বে ও সম্ভ্রমে এমন অনির্ব্বচনীয় করিয়া করিয়া লওয়া যায়, এ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় সে কথাটাও সে ভাবিতে লাগিল।

সিতাংশু একটা মোকর্দ্দমার জন্য দিন দুই হইতে জেলা-কোর্টে গিয়াছে। তাহার যাইবার পরের দিন হইতে সবিতার জ্বর হইয়াছে। এই পরম সহিষ্ণু রমণী অন্যের কাছে সেবা লইতে হইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। ছায়া তাহার শিয়রের কাছে একটুখানি বসিতে না বসিতেই সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। বিকালের দিকে জ্বরটা বাড়িয়াছে, প্রায় ১০৪ ডিগ্রী। মাথায় ওডিকলোনের পটি দিয়া ছায়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল, বাহিরে সিতাংশুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সবিতা এতক্ষণ কেমন আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল এখন চকিত হইয়া উঠিল। সিতাংশু ঘরে ঢুকিল, রোগের বিবরণ শুনিয়া এবং ঔষধপত্রের নিয়ম বুঝিয়া লইয়া কহিল, "বৌদি, আপনি এইবারে যান একটু বিশ্রাম করুনগে। আমি এসেছি। এখন থেকে আমিই এখানে থাকব।"

ছায়া পাখাখানা রাখিয়া উঠিয়া গেল কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না। বাহিরের বারান্দায় জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, সিতাংশু খাটের ধারে যেখানে বসিয়াছিল সবিতা আরও একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কাছে আসিল। সে যেন স্বামীর ওইটুকু স্পর্শ তাহার রোগকাতর শরীরটাকে দিতে চায়। এইটুকুতেই তাহার মুখে একটী আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা সব তুচ্ছ ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া সেখানে অভিভূত সুখের একটি তন্ময়তা!

সবিতার রূপ, তাহার শিক্ষাদীক্ষা সবগুলাকেই এতদিন ছায়া এত অকিঞ্চিৎকর নিজের চেয়ে এত খাট মনে করিয়াছিল যে তাহাকে অনুকম্পার চোখে দেখা ছাড়া ঈর্ষা করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। শ্বশুর বাড়ীর পরিবার পরিজনের প্রতিও তাহার কোনদিন খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। কিন্তু বাতায়নপথে এই দৃশ্য দেখিয়া আজ হঠাৎ তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে হইল জীবনে সে খুব বড় একটা জিনিষ হইতে বঞ্চিত আছে অথচ যাহার স্বাদ তাহার চেয়ে সর্ব্বাংশে অযোগ্য এই মেয়েটা অনায়াসে পাইয়াছে।

তখন অগ্রহায়ণের সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। আঙ্গন শয়ন ঘরে আসিয়া শীত অপরাহ্নের সেই সূর্য্যাস্তের দিকে চাহিয়া মনে মনে সে বোধ করি এই সকল কথাই নাড়াচাড়া করিতেছিল। সুধাংশু ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'সিতাংশু যখন এসেচে তখন আর কোন কথা নেই, আর তাছাড়া ছোট বৌমার অসুখও তেমন কিছুই নয়। সামান্য। আমি বলি, আমরা তা'হলে কালই যাই।"

অস্ত সূর্য্যের আভায় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে চাহিয়া ছায়া বলিল, "তোমার ছুটি নাই তোমাকেত যেতেই হবে। কিন্তু আমি আরো ক'টা দিন থেকে যাব ভাবছি। আমার ভারি ভালো লাগছে!"

—শেষ—

# আশা

— শামসুন্নাহার ইউসুফ

যেদিন তুমি আসবে প্রিয়
হৃদয়-কমল বনে
জাগবে ফাগুন ভুবন ভরি
হঠাৎ অকারণে।
উজ্জল আলোয় হাসবে ধরা,
বাজবে বাঁশী হৃদয়-হরা,
গাইবে পাখী ফুলের শাখে
কেবল খনে খনে,
যেদিন তুমি আসবে প্রিয়
আমার ভীরু মনে।

যেদিন তুমি আসবে প্রিয়
গোপন হৃদয়-দ্বারে
রাত্রি-দিনের মিলন-ক্ষণে
আবছা অন্ধকারে।
শুক্ল নিশা চাইবে সুখে
তোমার আমার দোঁহার মুখে
দুলবে কত পুলক-ব্যথা
হৃদয় পারাবারে
যেদিন তুমি আসবে প্রিয়
গোপন হৃদয়-দ্বারে।





আসবে তুমি প্রেমিক আমার
তড়িৎ-হরা পায়
আঁখির আগুন লাগবে গিয়ে
গগন-তারার গায়।
হাস্নাহেনা ঈর্ষা ভরে
আপন গন্ধে গর্ব্ব করে',
চাইবে তোমার মন টলাতে,
পারবে না তা' হায়
যেদিন তুমি আসবে প্রেমী
আমার আঙিনায়।

আসবে তুমি আসবে প্রিয়
সেই আশাতে আজি
কণ্ঠে আমার ছন্দ-মধুর
গান উঠিছে বাজি।
যেই স্বপনে তটের কোলে
নানা কথার ছন্দ দোলে,
চন্দ্র হাসে, ভুবন ভোলে,
সেই স্বপনে সাজি
মনের মনে অপূর্ব্ব কোন
পুলক উঠে বাজি!

---

# ব্যথার পরশ

—কুমারী জাহানআরা বেগম চৌধুরী

মধুপুর ষ্টেশনের পাশেই একখানা ছোট্ট একতলা বাংলোবাড়ী। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর অধিবাসী ছিলো তিনটি প্রাণী। মঈনুদ্দীন—,স্ত্রী 'আমিনা', আর ছিলো একটি টুকটুকে পাঁচ বছরের মেয়ে 'টুকু'। মনে তাদের সুখ ছিলো অফুরন্ত—সংসার ছিলো শান্তির বেড়া দিয়ে ঘেরা।

মঈনুদ্দীন সামান্য মাইনের রেলে চাকরী করত। তাছাড়া পিতৃসম্পত্তির ভাগও কিছু পেয়েছিলো। ছোট্ট সংসারে তাদের কিছুরই অভাব ছিলো না। ভোরের আলো তার সোণার করস্পর্শে যখন উষার ঘুমন্ত চোখের জড়িমা ভেঙ্গে দেয় আমিনা তখন আস্তে আস্তে ঘুমন্ত মেয়ের গালে একটি ছোট্ট চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সারা দিনের কাজে লাগতে।

টুকু জেগে পাশে মাকে না দেখে হয়ত কেঁদে ওঠে। আবার কোনদিন বা পা টিপে টিপে চলে যায় সোজা রান্নাঘরের দিকে। আমিনা হয়ত তখন ভিজে কাঠে আগুন ধরাতে গিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ডাগর দুটী চোখে ধোঁয়ার জ্বালায় বন্যা বয়ে যাচ্ছে—তাই বিরক্ত হয়ে যখন উঠতে যায় অমনি পেছন থেকে কার দুটী ছোট্ট কোমল বাহুর বন্ধনে চোখ দুটো তার বাঁধা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে—"আম্মা—বলো তো আমি কে?" আমিনা ওর হাত দুটো ধরে সামনে টেনে এনে কোলের ওপর ফেলে মুখখানা চুমুতে ভরিয়ে দিয়ে বলে—"তুমি—আমার আ-নন্দ" টুকু সজোরে মাথা নেড়ে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"ধ্যেৎ—আ-ন-ন্দ না,—আন-ন্দ বিচিরী···।" "পয়েন্টস্ ম্যানি" আনন্দসিংকে টুকু ভয় করত যথেষ্ট—ভোজপুরী চেহারার জন্যই হোক কিম্বা তার ঘর্ম্মাক্তকলেবরে টুকুকে পেশোয়ারী আদরের ঠেলায় অস্থির করে তোলার জন্যই হোক।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ আনন্দ বিচ্চিরী—তুমি আমার টুক!" বলে আমিনা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে টুকুকে বুকে চেপে ধরে।

দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট পকেট ঘড়ির কাঁটাটি দশটার ঘরে পৌছলেই মঈনুদ্দীন খেতে বসে। সাম্‌নে বসে মাছি তাড়ায় আমিনা। টুকু কাছেই ঘোরাঘুরি করে—একটা কাগজের জুতোর বাক্সোয় দড়ি বেঁধে রেলগাড়ী তৈরী করে কিম্বা মঈনুদ্দীনের বড় বড় দুটো চটী জুতোর ভিতর পা ঢুকিয়ে দালানময় পা টেনে টেনে চলে। মাঝে মাঝে ছুটে এসে হয়ত একটু তরকারী তুলে মুখের ভেতর পুরে দেয় তারপর হাসতে হাসতে আবার ছুটে চলে যায়।

খাওয়া-শেষে জানালার ধারে উঁচু জায়গাটায় মঈনুদ্দীন বসে একটু বিশ্রাম করে। টুকু ছুটে এসে একটা পান গুঁজে দেয় মুখের ভেতর। এই কাজটা সে আমিনার হাত থেকে কেড়ে নিয়েচে। আমিনা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে মঈনুদ্দীনের পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় ঠিক পাঁচটার সময় ফেরার জন্যে। মঈনুদ্দীন হাসে—,উত্তর দেয় "শত চেষ্টা করলেও যে পাঁচটার এক মিনিট বেশী নিজেকে বাইরে ধরে রাখা সম্ভব নয় তা কি আজ আবার তোমায় নতুন করে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে?" আমিনা তবু ঘাড় নেড়ে বলে "না—ফেরবার সময় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলে যদি দেরী হয়ে যায়! সে কিন্তু হবে না।" মঈনুদ্দীন ওর সামনের ছোট্ট চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে—"আচ্ছা।" তারপর টুকুকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে আমিনার কাছে বিদায় নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। বার বার পিছু ফিরে দেখে—যতক্ষণ দেখা যায়। আমিনা টুকুকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় স্নান করতে।





খাওয়া দাওয়ার পর ঝিয়ের জন্যে এঁটো বাসন বারান্দায় বের করে রান্নাঘরের শেকলটা আমিনা তুলে দেয়। টুকুকে বুকের কাছে ধরে একটা মাদুরে শুয়ে পড়ে। মাকে জড়িয়ে ধরে টুকু প্রশ্ন করে—"আম্মা—! আমার অ-আ বই শেষ হয়ে গেলে তখন তো আর মাষ্টার মশাই আসবে না? তখন আমিই যাব মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ী পড়াতে? কার সঙ্গে যাব আম্মা? পানী পাঁড়ে? না কাণ্টুর সঙ্গে? আচ্ছা আম্মা, মাষ্টার মশাই অ-আ ভুলে গেলে তাঁকে আমিই লাঠি দিয়ে মারব? না তোমার কাছে ধরে আনব—তুমি মারবে! আম্মা তোমার বেড়াল মারা লাঠিটা কৈ? সেইটে দিয়ে মারবে—? যাই লাঠিটা এনে রাখি—!" বলেই উঠতে যায় আমিনার তন্দ্রা ভেঙে যায়—হাতটা ধরে চেপে শুইয়ে দিয়ে চাপড়াতে থাকে। টুকু চটে যায়। দু'একটা কথা বলে আমিনা আবার ওকে শান্ত করে।

হঠাৎ টুকু আবার আরম্ভ করে "আম্মা—আমার কিন্তু বড্ড ভয় হয়—,যদি রসগোল্লার পা থাকত তবে ত তারা ছুটে পালাত—তখন আমরা কি খেতাম আম্মা? রসগোল্লা যে আমি বড্ড ভালবাসি!" কোন উত্তর না পেয়ে মায়ের বন্ধ চোখ দুটো দুই আঙুল দিয়ে টেনে ফাঁক করে দেয়! আমিনা বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শোয়। টুকু চুপ করে তাকিয়ে থাকে দূরে—ঐ ঢাকা চাপা রসগোল্লার দিকে—ভাবে কখন বিকেল হবে।"

আমিনা হঠাৎ জেগে দেখে—টুকু মাটিতে পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওকে বুকের মাঝে টেনে নেয়—চুমুতে চুমুতে নরম গাল দুটি ভরিয়ে দেয় কোঁকড়ান ছোট ছোট চুলগুলো আস্তে আস্তে কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে মায়ের সবটুকু আগ্রহ নিয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে দেখে ওর ওই হাসিহাসি নিখুঁত মুখখানা। তারপর উঠে যায় ওর অসম্পূর্ণ জামাটা শেলাই করতে।

ঘুম থেকে উঠে টুকু কেঁদে ওঠে মাকে না দেখে। আমিনা ছুটে এসে তাকে কোলে করে, চুমু খেয়ে ঢাকা খুলে রসগোল্লা দেখায়—টুকু হেসে খেতে বসে। তারপর খস্‌খসে গামছাটা ভিজিয়ে আমিনা বসে ওকে পরিস্কার করতে। বেড়াতে যাবার জামাটা পরিয়ে দেয়। যথা সময়ে পানী পাঁড়ে আসে—'খোকীকে' বেড়াতে নিয়ে যায় ষ্টেশনের দিকে।

আমিনা স্বামীর বৈকালিক খাবারের ব্যবস্থা করে। সাঁওতাল ঝিটার সঙ্গে মনের সুখে সাঁওতালি ভাষায় গল্প করে নেয়। হঠাৎ একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যায় গা ধুতে। কোন দিন নীলাম্বরী শাড়ীটা পরে কোনদিন বা শাশুড়ীর গুল্‌বাহারটা। বকুল-ফুলের গয়না পরে হাতে গলায়,—খোঁপায় হয়ত রক্তকরবী। তারপর এসে দাঁড়ায় পর্দার পাশটিতে স্বামীর প্রতীক্ষায়! স্বামী বাড়ী আসে যথা সময়েই। টুকুও বাড়ী ফেরে একটু পরেই পানী পাঁড়ের ঘাড়ে চড়ে।

ক্রমে বেলা পড়ে যায়—চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। সামনের বাগানটিতে ছোট একটা খাটীয়া পেতে মঈনুদ্দীন টুকুকে বুকের ওপর রেখে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনায়! রান্নাঘরে আর আমিনার বসা হয় না। রান্না চাপিয়ে ছুটে এসে স্বামীর পাশটী ঘেঁসে বসে—কথায় গল্পে মস্‌গুল্ হয়ে গেলে কোনদিন হয়ত রান্না পুড়েও যায়!

এম্‌নি করেই আনন্দের ভেতর দিয়ে তদের দিনগুলো বেশ এগিয়ে চল্‌ছিল। কিন্তু সে আনন্দ হয়ত ভগবানের সহ্য হোল না।

হঠাৎ একদিন ঐ পাঁচ বছরের মেয়েকে স্বামীর কোলে তুলে দিয়ে দু'দিনের জ্বরে আমিনা চলে গেল কোন্ এক অজানা দেশের সন্ধানে। মঈনুদ্দীন কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষুদ্র টুকুকে আশ্রয় ক'রে।

তিন বছর চলে গেছে, টুকুও এখন একটু বড় হয়েছে। কিন্তু তিন বছর আগে মায়ের মৃত্যু-শীতল দেহের স্পর্শে তার শিশু বুকের ব্যথা সেই যে বুকের মাঝেই জমে পাথর হয়ে গেছে,—সেই থেকে সে আর কাঁদে না, হাসেও না, কথা কয় অল্প! বিভোর হয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকে—প্রাণের আকুল কান্নার বাণী দিয়ে হয়ত সে তখন কথা কয় তার চলে যাওয়া মায়ের সাথে।

বৈশাখের একটা নিঝুম দুপুর। টুকু ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে সাম্‌নের মহুয়া তলায় বসে পড়ল। এই জায়গাটা তার ছিল সবচেয়ে প্রিয়। ক'একটা শুক্‌নো পাতা নিয়ে সে তখন নাড়াচাড়া করছিল—হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ এলো "খুকী, চুড়ী পর্‌বে?" টুকু চম্‌কে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে চুড়ীর ডালা মাথায় এক চুড়ীওলী। বয়েস তার মায়েরই মতন হবে। পরণে একখানা ময়লা কাপড়।

টুকুকে দেখে সে পলকহীন চোখে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঝুড়িটা নাবিয়ে টুকুর পাশে বসে পড়ল। "মণি—একটু পানী খাওয়াবে?" তার গলার স্বর কেঁপে উঠল। টুকু অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌ল,—"তোমার অসুখ হয়েচে—? দাঁড়াও আমি জল এনে দিচ্ছি!" এই বলে টুকু যেই যাবে সে আবার ডাকল "খুকি!" টুকু ফিরে চাইল। "মণি একবার কাছে আসবে?" যন্ত্রচালিতের মত টুকু ধীরে ধীরে তার পানে এগিয়ে এলো। সেই চুড়ীওলীর বুকে তখন প্রলয় নাচন সুরু হয়েছে! তার মনে হল সে আর পারবে না নিজেকে চেপে রাখতে! হায়! তার মেয়েটা যদি বেঁচে থাক্‌ত ঠিক এত বড়টাই হোত—এম্‌নি করেই পা ফেলে ফেলে তার পানে এগিয়ে আস্‌ত। তার দুচোখ বেয়ে ধারা বয়ে গেল—। ইচ্ছা হচ্ছিল তার ছুটে গিয়ে টুকুকে বুকের মাঝে চেপে ধরে চীৎকার করে কাঁদতে। সে পাগলের মত টুকুর পানে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে—তাকে বুকের মাঝে পাবার জন্যে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে হাত দুটো সজোরে সরিয়ে নিলে। যেন সে যাচ্ছিল আগুনে হাত দিতে! সে যে গরীব চুড়ীওলী—ছোটলোক! ভদ্রলোক—বড়লোকের মেয়েকে সে কোন্ সাহসে বুকে টেনে নিতে যাচ্ছে? কিসের অধিকারে? মাতৃত্বের? স্নেহের? কি মূল্য আছে তার মাতৃত্বের? কি মূল্য আছে তার স্নেহের? সে যে গরীব মা—ছোট জাত! মায়া—দয়া—স্নেহ—প্রেম—সবই যে এখানে সীমার গণ্ডী দিয়ে ঘের!

টুকু ধীরে ধীরে তার কাছে গেল—ছোট্ট একখানা হাত তার মাথার ওপর বুলিয়ে দিয়ে করুণ সুরে বল্‌ল, "কি হয়েছে তোমার—বল্‌বে না? কিদে পেয়েছে বুঝি—দাঁড়াও আমি খাবার এনে দিচ্ছি!" সে আর পারলে না নিজেকে ধরে রাখতে তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—এ কিদের তৃপ্তি এ জন্মেত তার আর হবে না! সে টুকুকে ধীরে ধীরে কাছে বসাল, তার ডালা থেকে দুটো ছোট্ট লাল টুক্‌টুকে চুড়ী বের করে নতমুখে টুকুর হাতে পরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। শেষে চুড়ী পরাণ হয়ে গেল কিন্তু টুকুর ওই হাত দুটো সে কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না—ছাড়লেই যেন তার সব শেষ হয়ে যায়। দু'ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করে টুকুর হাতে পড়ল। টুকু চম্‌কে উঠে বল্‌ল—"কি হয়েছে বলো না গো!" চুড়ীওলীর কাণে হয়ত সে কথা গেল না—সে ধীরে ধীরে মুখ তুলে বল্‌ল—"খুকী তোমার মা তোমায় খু—ব ভালবাসেন?" টুকুর মুখ বাদল দিনের মেঘের মত কাল হয়ে উঠল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না সে অতি করুণ—মর্ম্মভাঙা চাউনি নিয়ে চেয়ে রইল সেই তরুণীর পানে। বলবে না "খুকী?" এবার টুকুর দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে মুক্তোর মত দু'ফোটা জল ঝরে পড়ল। টুকুর ঠোঁঠ দুটো কেঁপে উঠল একবার। হয়ত সে কি বলতে চেয়েছিল—কিন্তু ভাষা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। চুড়ীওলী নিজের অতৃপ্ত মাতৃত্বকে নিজের শাসন শৃঙ্খলে আর বেঁধে রাখতে পারলে না। পাগলের মত ছুটে গিয়ে টুকুকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে তার ছোট নরম গাল দুটো চুমুতে আর নিজের চোখের জলে ভরিয়ে দিলে। টুকু স্বপ্নাবিষ্টের মত তার বুকের মাঝে পড়ে রইল! সে যেন আজ বহুদিন পর তার হারানো মায়ের কোল ফিরে পেয়েছে! হঠাৎ চুড়ীওলী চম্‌কে উঠে টুকুকে সবলে বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার জ্ঞান ফিরে এল—সে করছে কি! যদি কেউ দেখে ফেলে! ধীরে ধীরে টুকুর কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে "জল দিলে না ত!" টুকু আস্তে আস্তে বাড়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। চুড়ীওলী উন্মাদিনীর মত একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইল!

একটু পরে এক বাটী জল নিয়ে টুকু এসে





পৌছল—কিন্তু সেই চুড়ীওলীকে আর দেখতে পেল না।

রাত্রে শুয়ে টুকুর ছোট হাতখানি বুকের ওপর রেখে মঙ্গীমুদ্দীন কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ চুড়ীতে হাত পড়তেই সে চম্‌কে উঠল। টুকুকে আস্তে আস্তে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে মঙ্গীমুদ্দীন বল্‌লে "এ চুড়ী কে দিয়েচে মা?" ধীরে ধীরে বাপের বুকের মাঝে লুকিয়ে ধরা গলায় টুকু বললে—"নতুন মা।" মঙ্গীমুদ্দীন অবাক হয়ে গেল কিছু বললে না। শিশু-মনের সুপ্ত বেদনাকে খুঁচিয়ে জাগাতে তার বাধলো। তাই বাধ্য হয়ে তার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করলে। পরদিন ঠিক সময় মত টুকু সেই জায়গাটিতে এসে বস্‌লো তার নতুন মার প্রতীক্ষায়। কিন্তু অনেকক্ষণ গেলেও কেউ এলো না শেষে সূর্য্য অস্ত গেল—অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তখন টুকু উঠে দাঁড়াল—অভিমান-ভরা ছল্ ছল্ চোখ নিয়ে সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তে সেই চুড়ীওলী একটা গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে সেইখানটায় লুটিয়ে পড়ল—যেখানে টুকু বসেছিল! আকাশের গায়ে তখন তৃতীয়ার চাঁদ হাসছিল!

এমনি করে আরো তিনটে দিন কেটে গেল তাদের না পাওয়ার মাঝ দিয়ে। টুকুর আনন্দের পরশ পাওয়া মন আবার ভরে উঠ্‌লো নিরানন্দের কালো ছায়ায়।

সেদিনও তার প্রিয় জায়গাটিতে টুকু বসেছিল—রোজ যেমন বসে থাকে। তার ব্যথাভরা বুকের প্রতিচ্ছবি আজ তার মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল,—সে যেন এক আহত হরিণ-শিশু। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো,—রোজ যেমন হয়। টুকু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পেছন থেকে কে যেন ডাকল "খুকু!" টুকু চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখল সেই চুড়ীওলী তার পানে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। দৃষ্টি তার ভাষাহীন, যেন সে পাগল! টুকুর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে টুকু তার দিকে এগিয়ে গেল—,অভিমানে তার ছোট বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছিল, কান্না-ভরা সুরে সে বল্‌ল "এতদিন আসনি কেন? আমি……" সে আর কিছু বলতে পারলে না,—উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বেগ তার কণ্ঠ রোধ করে দিলে। চুড়ীওলী তাকে বুকে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বল্‌লে কাল থেকে রোজ আসব। তারপর অনেক গল্পসল্পের পর সন্ধ্যা হলে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে মহুয়া গাছের তলায় আবার দু'জনের দেখা। তারপর দু'জনের প্রাণখোলা হাসি গল্প—সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। এমনি করে তিন চার দিন। শেষে একদিন চুড়ীওলী এসে দেখে মহুয়া গাছের তলায় টুকু নেই। সে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসে থেকে শেষে হতাশ হয়ে উঠে গেল। তারপর দিনও এসে যখন টুকুকে দেখতে পেল না তখন সে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। চম্‌কে উঠে ভাবলে অসুখ করেনি ত! হাত জোড় কয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো "একেও কেড়ে নিও না খোদা।" তারপর ধীরে ধীরে চুড়ীর ডালাটা মাথায় করে হাঁক্‌তে লাগলো "চুড়ী চাই—ভাল রেশমী চুড়ী গো—!" বুকের মাঝে বয়ে যায় প্রলয়ের ঝড় তুফান—আশা নিরাশার ঘাত প্রতিঘাতে তার সমস্ত দেহমন কেঁপে ওঠে। টুকু কি তার গলার স্বর শুন্‌তে পাবে না—সেকি চিন্‌তে পেরেও তার কাছে আস্‌বে না আর! সে আর ভাবতে পারে না—চীৎকার করে ওঠে চুড়ী চাই—? ভাল রেশমী চুড়ী! টুকুর বাড়ীটার চারপাশে সে হেঁকে হেঁকে ফেরে। কিন্তু বৃথা তার হাঁকা! সে ডাক শুনে আকুল আগ্রহে কেউ ছুটে আসে না। ক্রমে সূর্য্য ডোবে! সারাদিনের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহে যে যার ঘরে ফিরে যায় বিশ্রামের কোলে নিজেদের বিলিয়ে দিতে। একটা—দুটো করে আকাশটা তারায় তারায় ভরে ওঠে, তবু সে বাড়ী ফেরে না সে আপন মনে হেঁকে যায়—"চুড়ী চাই গো—ভাল চুড়ী—!" শ্রান্ত হয়ে হয়ত একটু চুপ করে। দূরে কোন্ গাছ থেকে একটা পাখী ডেকে ওঠে "ফটিক—জল! ফটিকজল!" সে চম্‌কে আরও চেঁচিয়ে ওঠে—"চুড়ী চাই—রেশমী চুড়ী গো—! এইভাবে রোজ চুড়ীওলী পাড়া দিয়ে ঘোরা ফেরা করে। শেষে পাড়ার লোকের সন্দেহ হোল—তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। বাকী রাতটুকু বসিয়ে রেখে সকালবেলা দারোগাবাবুর দয়া হ'ল। তাকে ছেড়ে দিলেন। প্রথমেই সে গেল মহুয়া তলায়। তারপর

টুকুর বাড়ীর চারিধারে একবার পাগলের মত ঘুরে এসে—, পাষাণ-শিশুর কোন সাড়া না পেড়ে মহুয়া তলায় শুয়ে পড়ল। যখন সে জেগে উঠল দেখলে—দিনের আলো অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে টুকুর বন্ধ জানালার কাছে এগিয়ে গেল, অতি সন্তর্পণে কাণ পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করলে কিছু শুনতে পেলে না, ছুটে মহুয়া তলায় গেল সেখানে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে শেষে উঠে চলে গেল। এম্‌নি করে আরও ক'টা দিন কেটে গেল।

সেদিন মাঝরাতে চুড়ীওলী ঘুরে বেড়াচ্ছিল—একই জায়গায় রোজ যেমন ঘোরে। কিন্তু চুড়ীর ডালা তার মাথায় ছিল না। চৌকীদারের নজরে পড়ে আবার তাকে থানায় যেতে হ'ল। কয়েকদিন বন্ধ করে রেখে শেষে সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হোল। ছাড়া পেল সন্ধ্যেবেলা। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সেই মহুয়া গাছের তলায়।

সেখানে কিছুক্ষণ ব'সে সে ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর পানে এগিয়ে গেল। সদর দরজা উন্মুক্ত ছিল। আজ ঐ চুড়ীওলী মানলো না কোন মানা—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে চলে গেল সোজা বাড়ীর ভেতরে। উঠানের কাছে গিয়ে দুহাতে সবলে সামনের দরজাটা চেপে ধরে সে আঁৎকে উঠে থম্‌কে দাঁড়াল, যেন স্থির প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা! পাহাড়ের ঝরণা-ধারার মত তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি তার চেয়েছিল উঠানে খাটিয়ার উপর শোয়ানো পা থেকে গলা পর্য্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা—টুকুর মৃতদেহের পানে। মুখের রং তার সাদা কাপড়ের সঙ্গে মিশে গেছে, ছোট কোঁকড়া চুলগুলো মাথার আশে পাশে অসহায় ভাবে পড়ে আছে। মাথার কাছে মাদুরে বসে একজন লাল টুপী মাথায় দিয়ে একটা মোটা বই করুণ সুরে পড়ছে—আর কয়েকজন নতশিরে তাকে ঘিরে বসে আছে,—লোবাণের গন্ধে চারিদিক মেতে উঠেছে। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না—লোবানের গন্ধে তার নিশ্বাস আটকে আসতে লাগলো। ফিরে দাঁড়িয়ে সে যেমনভাবে এসেছিল সেই ভাবেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল তাদের প্রথম মিলনের সেই জায়গাটিতে। স্থির হয়ে একটু দাঁড়াল তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে "চুড়ী নেবে রেশমী চুড়ী গো" বলে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন সকলে সবাই অবাক হয়ে দেখল নতুন ছোট্ট কবরটার ওপর একটা চুড়ীর ডালা উবুড় হয়ে পড়ে আছে, আর তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানান্ রঙের কাঁচের চুড়ী—যেন কবরের ওপর রামধনু উঠেছে!···

তারপর থেকে সেই চুড়ীওলীকে আর কেউ দেখেনি।

——

# কিবা গান

—শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

কুলু কুলু কিবা গান ভরিয়া শ্রবণ প্রাণ
সদা কেবা গাও?
এক তান এক সুর সুধা ধারে ভরপুর
অরণ্য জাগাও।
নিভৃত নির্জ্জন ঠাঁই জীবন প্রবাহ নাই
শুধু এক গান





গিরি অঙ্গে ঝরঝরে লতা পত্রে মরমরে
উদার মহান।
কে বাজায় কেবা গায় নেত্রে নাহি দেখা যায়
অদৃশ্য স্বপন.
প্রতিধ্বনি সংকেত গীতরবে মুখরিত
থামেনা কখন।
পর্ব্বত প্রান্তর ভরি ঐক্যতান সরি সরি
সঙ্গোপনে ধায়,
শৈলশৃঙ্গে, সমতলে, সে গীত নাচিয়া চলে
তরঙ্গের প্রায়।
কার স্বর দুলে দুলে আনমনে সব ভুলে
দূর দূরান্তর
ছুটে, পুনঃ ফিরে আসে গীতধ্বনি পরকাশে
গোপন অন্তর,
নয়ন হেরিতে নারে হৃদয়ের সমাচারে
কিবা কথা তার,
সঙ্গীতের তালমানে অতীত কাহিনী আনে
স্মৃতির মাঝার,
কল কণ্ঠ বিহঙ্গম তরু শাখে অনুপম
গায় এক গীতি,
নিশীথ নিদ্রার ঘোরে সেই গান নিশাভোরে
শুনি নিতি নিতি;
ভুলে যাই বর্ত্তমান গত স্মৃতি মূর্ত্তিমান
দেখা দেয় আসি,
কত কথা পড়ে মনে অশ্রু বিন্দু নেত্র কোণে
হৃদি যায় ভাসি,
অদূরে আমার গেহ সেথায় নাহিক কেহ
সব লোকান্তরে,
তাহাদের স্নেহ প্রীতি এ গান বিগত স্মৃতি
শরীরী আকারে,
মনোহর পল্লীবাসে প্রেমের বন্ধন পাশে
ছিল যে বন্ধন,
সে পাশ যায়নি ছিঁড়ে জাগে চিত্তে ধীরে ধীরে
অপূর্ব্ব মোহন।

———

# গালিচার কথা

—শ্রীনীহারবালা দেবী

মানুষের সহজাত সৌন্দর্য্যজ্ঞান হইতে যতগুলি শিল্প জন্মলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে কার্পেট বা গালিচা একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গালিচার জন্মস্থান পারস্য। তথা হইতে ইহা আফগানিস্থান হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে কাশ্মীর ও জয়পুর গালিচাশিল্পে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। সংযুক্তপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যেও ইহা যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই শিল্প ভারতবর্ষের বহু কারুশিল্পীর উপজীবিকার আধার।

য়ুরোপের যন্ত্রনির্ম্মিত গালিচা যথেষ্ট সুলভ হওয়ায় দেশীয় হস্তনির্ম্মিত গালিচার চাহিদা কিছু কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি ভাল পুরু এবং টেকসই গালিচা যাঁরা চাহেন তাঁহাদের নিকট এখনও হস্তনির্ম্মিত গালিচার আদর পূর্ব্ববৎ আছে। এখান হইতে বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের গালিচা প্রতিবৎসর বিদেশে যায়। এই রপ্তানীর বেশীরভাগই এমেরিকায় প্রেরিত হয়। রপ্তানীর ব্যবসার প্রায় সমস্ত ভাগই য়ুরোপীয় এবং এমেরিকানদিগের হস্তে।

আজকাল ছোট বড় গালিচা অনেকেই ব্যবহার করিতেছেন। ধনবান গৃহস্থের দরবার ঘরটীর সমস্ত জমিটাই হয়ত মূল্যবান গালিচায় ঢাকা। মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরেও হয়ত কয়েকটী ছোট, মাঝারী গালিচা দিয়া বসিবার ঘরটী সাজান হয়। অনেকে চেয়ারে গদির পরিবর্ত্তে ছোট গালিচার আসন পাতেন তাহাতে শোভা বরং অনেকটা বাড়ে এবং যথেষ্ট আরামও পাওয়া যায়। অনেকে আবার ইচ্ছা সত্বেও এসকল কিছু করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি জানিতে পারিতেন যে তাঁহারাও নিজেরা ইচ্ছামত গালিচা বানাইয়া নিজেদের ঘর সাজাইতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আনন্দিত হইতেন। আবার যাঁহাদের অবসর বেশী আছে তাঁহারা বেশী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ও করিতে পারেন। আজকালকার আর্থিক দুর্দ্দশার দিনে ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায়।

গালিচা দুই প্রকারে প্রস্তুত করা যায়—ফ্রেমে বুনিয়া এবং ক্যানভাসে হুক দিয়া সুতা গাঁথিয়া। প্রথম উপায়ে বোনা গালিচাই দেশ-বিখ্যাত। ইহাতে কাপড় বোনা এবং তাহার উপর উল গাঁথা দুই কাজই এক সঙ্গে করিতে হয়। কিন্তু এইপ্রকারে গালিচা বোনা সকলের পক্ষে সকল সময় সুবিধাজনক নহে। দ্বিতীয় উপায়ে অতি সহজে গালিচা প্রস্তুত করা যায়। ইহার জন্য বিলাতী জাল ক্যানভাস পাওয়া যায়। তাহাতে মোটা হুক দিয়া উলসুতার ফাঁস দিয়া এক একটী ঘর ভরিয়া যাইতে হয়।

আজকাল চটের আসন অনেকে প্রস্তুত করিতেছেন। ঠিক সেইভাবে চটের উপর উলের সুতা দিয়াক্রস্‌ষ্টিচ্‌ বুনিয়া যদি তাহাকে একটী কড়া ব্রাস দিয়া ঝাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মোটামুটী আসন তৈয়ার করা যায়। কিন্তু ইহাতে গালিচার বিশিষ্ট পুরু এবং নরম ভাবটী পাওয়া যায় না। ইহার জন্য উলের সুতাগুলিকে কতগুলি একমাপের টুকরা করিয়া লইতে হইবে। এই কাজের জন্য স্লেটের ফ্রেম হইতে ছোট একটী কাঠ লইয়া তাহার উপর সমান ভাবে সুতা জড়াইতে হইবে। তাহার পর খাঁজের মধ্য দিয়া ধারাল কাঁচি কিংবা ছুরী দিয়া কাটিয়া লইলেই একমাপের অনেকগুলি টুকরা পাওয়া যাইবে। এইবার একটী টুকরার দুই মাথা একত্র ধরিয়া চটের এড়ো সুতা অর্থাৎ পড়েনে উহাকে একটী ফাঁশ দিয়া বাঁধিতে পারিলে ডিজাইনের অর্থাৎ নক্সার একটী ঘর ভরা হইল। এইভাবে পর পর উপরে এবং পাশে উপযুক্ত রংয়ের সুতার ফাঁস পরাইয়া গেলে আসন প্রস্তুত হইল; তাহার পর উহার নীচে একটী রং করা কিংবা সাদা চট ধার মুড়িয়া লাগাইয়া দিলে বেশ সুন্দর ব্যবহারযোগ্য আসন প্রস্তুত হয়। সমস্ত গালিচাটী এইভাবে প্রস্তুত হইলে পরে একটি ভাল কাঁচি দিয়া উহার উঁচানীচা ভাগগুলি সমান করিয়া ব্রাশ করিলেই আসন সম্পূর্ণ হইল।

---

# দেশবিদেশের কৃতী মহিলা

## ভারতবর্ষ

স্বাস্থ্য বিজ্ঞালয়ের নারী তত্ত্বাবধায়ক

নবাব-জাদী ইসমৎ খানম মওলা বক্‌শ—ইনি পাঞ্জাব "পাবলিক হেলথ্‌ স্কুলের" নারী-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-বিজ্ঞানে উচ্চ ট্রেণিং গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম সি-এম-বি

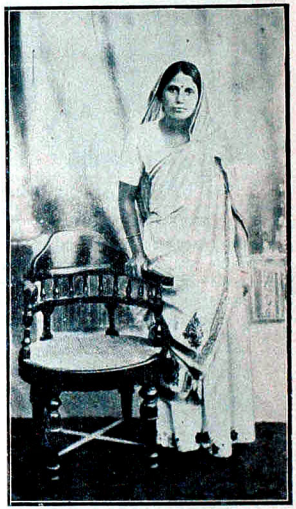

শ্রীযুক্তা চন্দ্রপ্রভা সাইকীয়ানী

আসাম মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা এবং উক্ত প্রদেশের মহিলা আন্দোলনের অগ্রদূতী। ইনি একজন সুলেখিকা

মিসেস্ নুরন্নবী চৌধুরী এম-এ

প্রসিদ্ধ "হারলুল মতিন" সম্পাদক, প্রাচ্য রাজনীতি-বিশারদ মরহুম আগা মুওয়াযীদ্-উল্-ইস্লাম সাহেবের কন্যা। এম-এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম হইয়া মেডেল পান। তৎপর আইন অধ্যয়ন করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল' হাইস্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন

কুমারী রজনীপ্রভা দাস

কৃতিত্বের সহিত এম-বি পাশ করিয়াছেন। আসামী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই উচ্চ ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করিলেন

গোলটবিল

ব্রহ্মদেশের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি

কুমারী আভাবাহ মেহ্তা

সিংহলের এই মহিলাটী ১৯ বৎসর বয়সে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়াছেন। কিন্তু কম বয়সের জন্য ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিতেছেন না

মিসেস শ্রীবাস্তব

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম মহিলা সদস্য

কুমারী জি, করণওয়ালা

এই পার্সী মহিলাটী গবর্ণমেণ্ট একাউণ্টেন্সী ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন

কুমারী সরলা দেশাই

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত তর্ক-প্রতিযোগিতায় জয়িনী হইয়া স্বর্ণ-পদক লাভ করিয়াছেন

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু

মহিলা ও শিশুদের নানাপ্রকার পীড়ায় বিশেষজ্ঞা

শ্রীযুক্তা নারায়ণী আইদেউ

বিগত আসাম মহিলা-সম্মিলনীর সভানেত্রী। বাল্য-বিবাহ, অবরোধ, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন করেন

মিসেস্ ই, এ, বাট

মাদ্রাজ নার্সেস এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী। প্যারিসে অধিষ্ঠিত ইন্টারন্যাসন্যাল নার্সেস কংগ্রেসের ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন

লেডী নীলকান্ত

ভারতীয় মহিলা প্রগতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন

মিসেস জামালুদ্দীন বি-এ

হায়দ্রাবাদ নিবাসী এই মহিলা ৬টী সন্তানের জননী হইয়াও শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য ইটালী দেশে গিয়াছিলেন

লেডি বাইরামজী জিজীভয়

ইনি বোম্বাইয়ের জাষ্টিস অফ্ দি পিস নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন

পোলাণ্ডের প্রথম মহিলা জজ

কুমারী ওয়ান্ড্ গ্রাবিন্স্কা

মহিলা নাট্যকার

ম্যাডাম্ জোয়েল স্থলরয়। ফরাসী দেশের বিখ্যাত উপন্যাস-গুলিকে নাট্যাকারে লিখিয়া ড্রামার উপযুক্ত করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন

প্রচার বিভাগের কর্ত্রী

মিসেস রেনা গিব্স্ স্কাড্মোর। "নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড"এর বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিভাগে চার বৎসর কাজ করেন। বর্ত্তমানে প্যারিসের একটী বিখ্যাত সংবাদ পত্রের প্রচার বিভাগের কর্ত্রী এবং সাংবাদিক মহলে সুপরিচিতা

দেশপ্রাণা বুলগেরীয় নারী

ম্যাডাম একাটেরিনা কারাভেলোভাকে সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী স্বদেশের বহুবিধ উন্নতি ও হিতমূলক কার্য্যের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে

লেডি বারউইক
বিলাতের জাতীয় মহিলা-মহাসভার নির্ব্বাচনে ৮৭৮০টি
ভোট পাইয়াছিলেন

অধিকার আন্দোলনের অধিনেত্রী
ম্যাডাম রীনো মামবার্গ
ফিন্‌ল্যাণ্ডের নারী-অধিকার আন্দোলনের প্রধানা কর্ণধার

বাম দিক হইতে ১। মিস কেথেলিন ডি, কোর্টনী (ইংলণ্ড), ২। মুৎস্যানিগন্‌সেৎ (জাপান), ৩। ডরোথি ভন, ভিসেন (জার্ম্মাণী), ৪। ম্যাডাম মেরিলুই পুঁয়েক (ফ্রান্স), ইঁহারা ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিগত শান্তি মহাসংসদে নারী-প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন

মিস্ মেরি ডি এণ্ডারসন
নিউইয়র্কের "ড্রিক-এ-ডে" নামক পত্রিকার স্বত্বাধিকারিণী ও পরিচালিকা। পত্রিকাখানির অসাধারণত্ব এই যে ইহা হোটেল ও বোর্ডিং হাউস সমূহের মুখপত্র

মহিলা নাবিক
ক্যাপ্টেন শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কি ডগ্‌লাস
ইনি সুদীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত 'মিসিপিসি' নদীতে জাহাজ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন

মিস্ র‍্যাথবোন
ইনি লিভারপুল মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম মহিলা সদস্য ও নারীর সমাজ-অধিকার সমিতির প্রেসিডেন্ট

মিসেস রোজা জিনবার্গ
সুদীর্ঘকাল প্যালেষ্টাইনের বিচারালয় সমূহে ব্যারিষ্টারী করিয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে লড়িয়া বিজয়িনী হইয়াছেন

মিস্ ববি ফিঙ্কহাম

কাঠ কারু-শিল্পে ইনি সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। লণ্ডনে ইঁহার চেরী, ওক্, ওয়াল্‌নট্ প্রভৃতি কাঠের শিল্প-কার্য্যের বিশেষ খ্যাতি আছে

মিস্ মেরি ই, প্রাইস্

বিলাতী সিভিল সার্ভিসের "লিগ্যাল প্রফেশন্যাল ষ্টাফে" প্রথম মহিলা

মিস্ ডিনা সারে

এই ইংরাজ মহিলাটী ফিল্ম ডিরেক্টররূপে বিখ্যাত হইয়াছেন

মিস্ হেরিটেজ রচ

ইনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত রয়্যী থিয়েটারের নৃত্য বিভাগের অধ্যক্ষা



# বিজয়িনী

—গল্প—

—বেগম সুফিয়া এন, হোসেন

শরতের শেফালী-ঝরা প্রভাত!

জেলার এস-ডি-ও আসমৎ আলী সাহেব প্রতিদিনই হয় পদব্রজে নহেত ঘোড়ায় চড়িয়া সকাল সন্ধ্যা ভৈরব নদের হাওয়া খাইতে যান। আজও গিয়াছিলেন। পদব্রজে!

একটু দেরী করিয়া—কিন্তু নিরতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া—তিনি গৃহে ফিরিয়া ততোধিক ব্যস্তভাবে পত্নীকে ডাকিলেন—হাজেরা! হাজেরা খাতুন তখন পুত্র স্কুলে যাইবে বলিয়া খাইতে বসিয়াছিল তাহারই তদারক করিতেছিলেন। স্বামীর ডাক শুনিয়া হাত না ধুইয়াই আসিয়া দেখা দিলেন।

আসমৎ আলী কহিলেন—"আজ নদীতীরে বেড়াতে গিয়ে আমার এক বন্ধুকে দেখতে পেলাম—কিন্তু তার অবস্থা যেরকম বোধ হয় বাঁচবে না। তাকে নৌকার মধ্যে একা ফেলে রেখে চাকর বাকরের হাতে ফেলে দিয়ে আমি থাকতে পারব না—হাসপাতালেও দিতে পারব না। তাকে আনতে আমি পাল্কি পাঠিয়ে এসেছি—বাল্যবন্ধু, বড় ঘরের ছেলে। এই অবস্থায় কী করে যে আছে জানি না—সম্পূর্ণ অজ্ঞান! তাকে আনাচ্ছি তোমাকে তার দেখাশুনা করতে হবে। মাসুমাও যেন একটু দেখে শুনে—সে কোথা?"

দ্বার পার্শ্ব হইতে যে আসিয়া উপস্থিত হইল সে কহিল—"কে ভাই এমন বন্ধু তোমার? তা দেখাশোনা করতে হবে তাতে আর আমার বাধা কি? তাকে রাখবে কোন ঘরে বলো, ঠিক করে দিই—"

আসমৎ পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন—যে ঘরটায় দুপুরে তোমাদের মজলিস বসে সেইটাই ভালো হবে, আসবাবও ওটায় কম আছে শুধু একখানা খাট পেতে দাও, কী বল? তোমার কিছু আপত্তি আছে?

হাজেরা কহিলেন, "না, না, আপত্তি কি? রোগা মানুষ, তোমার বন্ধু—তাকে দেখাশোনা করতে পারব, আর ঘরখানাই দিতে আপত্তি হবে নাকি? কিন্তু কে তিনি—নামটাও কি বললে চিনব না?"

আসমৎ কহিলেন "নাম ত নিশ্চয়ই জানো, দেখেছও ত তাকে, সেই পাবনার আবুল কাসেম চৌধুরী—"

তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বাহিরের দিকে; দেখিলেন, পাল্কী আসিতেছে। ত্বরিতপদে তিনি নামিয়া গেলেন। নামটা শুনিয়া মাসুমা যে একটুখানি চমকাইয়া উঠিল তাহা কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

হাজেরা কহিলেন,—"ওইত পাল্কী এসে পড়ল। মাসু, মধ্যের বড় টেবিলটা সরিয়ে তোমার ঘরের খাটখানা পেতে দাও—মাজু যখন আসবে ততদিন আমরাও এখানে থাকব না—বন্ধুও সেরে উঠেই চলে যাবেন—যাও তুমি, আমিও যাই ছোট টেবিলটা আমার ঘর থেকে দিই গিয়ে, অত বড়লোক, আহা বেচারা! ভাগ্যে উনি দেখেছিলেন।" দুই-জনে দুইদিকে কাজে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে মসজেদের নমাজীরা নমাজ পড়িয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। আসমৎ কাছারী হইতে ফিরিয়া সামান্য কিছু খাইয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সেই যে পাল্কী হইতে সাবধানে নামাইয়া বিছানায় শোওয়ান হইয়াছে অজ্ঞান অবস্থায়—এখন পর্য্যন্ত জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যায় নাই—সরকারী ডাক্তার ছাড়া অন্য একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকেও দেখান হইয়াছে। তাঁহারা রোগীর জীবনের সামান্য আশাও

দেন নাই—আবার আশঙ্কাও প্রকাশ করেন নাই। অত্যধিক অত্যাচারে অনিয়মে শরীর ভাঙ্গিয়াছে, ব্লডপ্রেসার বাড়িয়াছে। সারাদিন মাথায় বরফ দিয়া রাখা হইয়াছে। প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকাও যেন নিঃসাড়ে হইতেছিল দুর্ব্বলতার জন্য। জ্ঞান হইলে কী হয় তাহাই ডাক্তারদের দ্রষ্টব্য।

আসমতের অনুরোধে বে-সরকারী ডাক্তারটী রাত্রের জন্য রহিয়া গিয়াছেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি আসিয়া দেখিতেছেন। হাজেরা মাসুমা নিয়মমত ঔষধ খাওয়াইতেছে, সেবার কোনই ত্রুটী নাই—আসমৎ বন্ধুর মুখের দিকে ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া আছে—সব আলো নিবাইয়া একটী মোমবাতি জ্বালাইয়াছে আগর বাতির সুগন্ধে ঘরখানা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

কাসেমের মুখখানা অনেকদিন কামানো হয় নাই বলিয়া খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরিয়া গিয়াছে। কিছু পাকা কিছু কাঁচা চুলগুলি রুক্ষ; পরিধানেও সামান্য মলিন বেশ। আসমৎ মনে মনে প্রার্থনা জানাইল,—"একে ভালো করিয়া দাও খোদা! অতুল ঐশ্বর্য্য স্ত্রী-পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে যদি এ অবস্থায় মরিয়াই যায় তো জানিবেও না যে বহুদিনের বন্ধু এমনি প্রার্থনা লইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।"

হয়ত খোদা বন্ধুর জন্য বন্ধুর এ প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। কাসেম এইবার নড়িয়া চড়িয়া যেন পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল। রক্তরাঙা আঁখি মেলিয়া চাহিয়া যেন অপরিচিত ঘরখানাকেই চিনিবার চেষ্টা করিল। শিয়রে বসিয়া মাসুমা বরফ ব্যাগ চাপিয়াছিল সে মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"ডাক্তারকে একবার ডাকো ভাই, হয়ত হোস হচ্ছে।" আগ্রহে ঝুঁকিয়া আসমৎ কহিলেন,—কাসেম—কাসেম! চেয়ে দেখো ভাই চিনতে পারছ আমাকে?... কাসেম দুর্ব্বলকণ্ঠে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া জানাইল চিনিতে পারিয়াছে। শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া কহিল, "আসমৎ"—আনন্দে আসমৎ কহিল এই যে আমি কাসেম! মাসুমা ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাও...কাসেম চমকিয়া উঠিল! ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, মাসুমা—মাসুমা কে?

ততক্ষণে মাসুমা চলিয়া গেছে, আসমৎ কহিল মাসুমা আমার বোন—তুমি আমার কাছে আছো আমাকে চিনতে পারছ?—কেমন লাগছে এখন? কাসেম তখনও সামলাইতে পারে নাই—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল··· কেমন লাগছে সুধাচ্ছো? আর কেমন·· তবুও খোদার কাছে হাজার শোকর, আমার মতো পাপীকে করুণা করে তোমার কাছে—তোমার মতো বন্ধুর স্নেহ ছায়াতলে মরতে দিলেন!

আসমৎ কহিলেন—ছিঃ ও কথা বলো না। তুমি ভালো হয়ে উঠবে কাসেম—এই যে ডাক্তার? এসেছ, এসো, দেখো ত—জ্ঞান ত বেশ হয়েছে, ঘামও হয়েছে, বোধ হয় জ্বরটাও ছেড়ে যাবে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁর মুখও প্রসন্ন হইল। একটু ব্যবধানে আসমৎকে কহিলেন, আশঙ্কার কারণ নেই, জ্বরটাও ভোররাত নাগাদ ছেড়ে যাবে। তবে বেশী উত্তেজিত না হয়, মাথায় রক্ত চড়লে আবার কী হয়—আর এইসব রোগীদের প্রায়ই দেখি উত্তেজিত হয়ে উঠেনই। যতক্ষণ জেগে থাকবেন কথা-বার্ত্তায় সুস্থ রাখবেন; ঘুম হলে ভালো। আমি ঔষধ বদলে দিচ্ছি—এখনও আমাকে থাকতে হবে, না বাড়ী যাব বলুন? আসমত তবুও ডাক্তারবাবুকে যাইতে দিলেন না। ডাক্তার ঔষধ বদলাইয়া পাঠাইতে নীচে চলিয়া গেলেন। হাজেরা আসিল; কাসেম তাহাকে দেখিয়া শীর্ণ হাত কপালে ঠেকাইয়া সালাম জানাইল। প্রতিসালাম করিয়া হাজেরা বরফব্যাগ মাথায় চাপাইয়া আসমতের প্রতি চাহিয়া কহিল "তুমি ব্যাগটা ধরো, আমি একটু কিছু এঁকে খাওয়াই, অনেকখন খাননি কিছু—"

আসমৎ তাহাই করিল। হাজেরা পথ্য খাওয়াইয়া সযত্নে মুখ মুছাইয়া কহিল—এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন জ্বরটা ছেড়ে যাবে মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

ক্লান্তিতে সত্যই কাসেমের চোখ জুড়িয়া আসিয়াছিল—আসমৎ ধীরে ধীরে কাসেমের শীর্ণ হাতদুখানিতে হাত বুলাইতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।





রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। সেই শব্দেই কাসেমের নিদ্রা টুটিয়া গেল। ডাকিল—আসমৎ! শিয়রের একটু কাছে বসিয়া মাসুমা মাথার হাওয়া করিতেছিল, অতি ক্ষীণালোকে মানুষ স্পষ্ট চেনা যায় না তবুও সে ডাক শুনিয়া সম্মুখে ঝুঁকিতেই কাসেমের চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! তীব্র উদ্বেগ-ভরা দৃষ্টিতে মাসুমার পানে চাহিল। মাসুমা সে দৃষ্টি দেখিয়া নিজেই একটু ভয় পাইয়া গেল; অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল···ভাইকে ডেকে দিচ্ছি। শিয়রের দ্বার দিয়া সে বাহির হইয়া গিয়া আসমৎকে পাঠাইয়া দিল আসমৎ আসিয়া কাসেমের ললাটে হাত দিল...“কেমন লাগছে?"

কাসেম উত্তর দিল না—নিশ্বাস তাহার বেগে বহিতেছে। চক্ষুর চাহনী কেমন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে আসমৎ তাহা দেখিয়া দ্বারের বাহিরে ভৃত্য ঘুমাইয়াছিল, তাহাকে সবলে ধাক্কা দিয়া কহিলেন—ডাক্তার—শীগ্‌গীর ডাক্! সে তিন লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। আসমৎ জোরে পাখা চালাইতে লাগিল। কাসেম হাত বাড়াইয়া আসমতের হাত ধরিয়া কহিল—"তোমরা কেন ডাক্তারকে ডাকছ? একটা কথা বলছি শোন! আমার শিয়রে কে বসেছিল, ঠিক বল ভাই!"

আসমৎ একটু বিস্ময়ে বলিল, কেন ও ত আমার বোন". "তোমার বোন? আপন বোন? কই আগেত শুনিনি?"। "কেন কি হয়েছে তাতে? তোমায় কিছু বলেছে নাকি মাসুমা?". "বাস, ওই নামটাই ভাই এইটুকুই আমি জানতে চাই, বলো?"

ডাক্তার আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন, একি আপনি এ রকম অধৈর্য্য প্রকাশ করছেন কেন, কী হয়েছে? বেশত জ্বরটা ক্রমেই কমছে, চুপ করে ঘুমান ত একটু···"হাঁ ঘুমাব কিন্তু তার আগে আসমৎকে কিছু বলে যেতে চাই। কী জানি যদি এই শেষ হয়।"। "ছিঃ কাসেম, আবার তুমি ছোট ছেলেদের মতো শুরু করলে?". "না—না ভাই ডাক্তারকে যেতে বলো! আমি তোমার কাছে কথা গুলো বলে যাই।"

ডাক্তার দেখিলেন সে বাধা পাইয়া আরো উত্তেজিত হইতেছে। কহিলেন---"আচ্ছা আচ্ছা...যাচ্ছি আমি। কিন্তু বেশী কথা যেন বলবেন না, ঘুমাবার চেষ্টা দেখুন।" কাসেমের অধরে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। হ্যাঁ হয়ত জন্মের মতোই···কিন্তু তার আগে যে তোমাকে কাছে পেলাম আসমৎ এই—এই—

বাধা দিয়া আসমৎ কহিলেন, চুপ কর কাসেম। ভোর হোক, তোমার কথা শুনব—এখন ঘুমাও ভাই। আসমতের হাত ধরিয়া কাসেম কহিলেন—হয়ত সে ঘুম থেকে আর নাও জাগতে পারি। আসমৎ, বলে যাই তোমাকে; বুকের ভার একটু কমাতে দাও ভাই, আর আমি পারি না। এ প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন পাপ একা মনে পুষে রেখে আর পারি না। আসমৎ চমকাইয়া উঠিলেন তারপর কহিলেন—আচ্ছা বলো—

"কিন্তু তোমার ঘুম হয়ত নষ্ট করলাম, আমার এ অবস্থায় তুমি অযাচিত আশ্রয় দিয়ে কষ্ট কেন করতে গেলে ভাই!

আসমৎ ধমক দিয়া কাসেমকে থামাইয়া দিলেন। হাজেরা আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন, আমি বসি এঁর কাছে। তুমি না হয় একটু শুয়ে নাও গিয়ে।" আসমৎ কহিলেন, কাল রবিবার কাছারী নেই, তুমি যাও, দরকার হলে ডাকব। মাসুমাকে ও শুতে বলো। "সে মাথার যন্ত্রণায় গিয়ে নিজেই শুয়ে পড়েছে তাই না আমি এলাম, তা আমাকে ডেকো কিন্তু!" "আচ্ছা...আচ্ছা ডাকব.". হাজেরা চলিয়া গেলেন। কাসেম কহিল, একটু পানি খাব ভাই। পানি খাওয়াইয়া আসমৎ মুখ মুছাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া কাসেম কহিল—

তোমার বোনের নাম মাসুমা, নয়? ওই মাসুমা নামে একজনাকে আমিও চিনতুম, চিনতুম ঠিক নয় কিন্তু লোকের কথা মতো চিনতুমই। তাই ওই নামটা শুনে আর একটু খানি না-দেখার-মতো দেখে, আমার মনে হল এই সেই··· সে যা হোক কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি ভাই সেই মাসুমাকে

যদি তুমি কোনদিন পাও—হ্যাঁ তার খোঁজ তোমার নিতে হবে—বন্ধুর এ শেষ অনুরোধ বলে…" আসমৎ কহিলেন, আঃ কী বকছ কাসেম? তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তোমার জিনিষ তোমারই খুঁজে নিতে হবে।

আমার জিনিষ? কখনও নয়। ও কারু নয় ভাই, হ্যাঁ, যা বলছিলুম শোন,—এই সব ওকে পেলে শুনিয়ে মাফ চেয়ে নিয়ো।—পাবনা ছোট কাল থেকে যাইনি জানত? কলকাতার নতুন বাড়ীতে যখন প্রথম ওঠা হলো, বাবা দেশেরও অনেককে দাওয়াত দিলেন। অনেকেই এলো—তার মধ্যে এই মাসুমাও এসেছিল…ওর বাপের সঙ্গে। ওর বাপ নাকি, কেমন ভাই—আমার বাবার। তিনিও এলেন। সৌম্য-শান্ত! কোলে এই মাসুমা বছর সাত আটেক হবে। আমার বয়স তখন পনের হবে। ঘর প্রবেশ উপলক্ষে সে কী ধুম! তাত তোমার মনে আছে? আমার ওসব উৎসব আরো যেন খুশীতে ভরে উঠেছিল ঐ মাসুমাকে পেয়ে…ছোট বোন ছিলনা কিন্তু তার অভাবও ত বোধ করি নি। মাসুমাকে দেখে আমার ভারী ভালো লাগল। এই ভালোলাগা কিন্তু তখনকার ভালো বাসা নয়, কিন্তু পরে,—একটু পানি দাও ভাই—

আসমৎ পানি দিয়া কহিলেন…"একটু চুপ থাকো ভাই, না হয় কাল শুন্‌ব।"

কাল হবে কিনা কে জানে ভাই…আর এখন যে-ভাবে বলব বেঁচে উঠলে কি আর ঠিক এই ভাবে বলতে পারব? শোন…আসমৎ দেখিলেন আপত্তি করিলে আরো উত্তেজিত হইয়া ওঠে অতএব চুপ করিয়া শোনাই ভালো—যদি মনটা হাল্কা হইয়া ভালো হইয়া ওঠে।

তাহাকে চুপ দেখিয়া কাসেম বলিল, হ্যাঁ কী বলছিলুম, সে দিন ধুমধামে মৌলুদ হয়ে গেল, সন্ধ্যার পর আমিও হয়রাণ হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম, মাসুমা আমার টেবিলের উপর চড়ে অগোছাল বইএর স্তূপ থেকে একটার পর একটা বই বের করে স-রবে নামগুলির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত। আমি ঘরে ঢোকাতে সে প্রথমটায় চুপ করে আবার বেশ সহজ কণ্ঠে আমাকে বল্লে—এতগুলি বই আপনার—সব আপনি পড়েন? আমি হেসে মাথা হেলিয়ে জানালাম যে, তাই। সে আবার আগ্রহের সহিত বই গুলি দেখতে দেখতে বল্লে, আমিও বড় হয়ে এত এত বই পড়ব, আমিও পড়তে শিখছি কিনা! আমি শুয়ে পড়ে বললুম, কী কী পড়তে শিখলে বলো ত? এক নিশ্বাসে সে হাসি খুশী থেকে শুরু করে উর্দ্দু পহলী কেতাব একটানা শুনিয়ে গেল। আমি হেসে বল্লাম তুমি কেমন ভালো পড়তে পারো, আমি তেমন পারিনা। সে অবিশ্বাস ভরে বল্লে…তবে এত বই বুঝি এমনি পেয়েছেন? আসল কথা আমাকে শোনাবেন না…না? সহসা তার বাম পার্শ্বের কামরা হতে ডাকলেন ..মাসুমা! সে এক দৌড়ে চলে গেল।

পরের দিন আমি স্কুল থেকে ফিরেছি, বইগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে মাকে খাবার দিতে বলে ছাতে গিয়ে টবের ফুলগাছগুলো বাগানে লাগাব বলে দেখতে গেছি—দেখলাম মাসুমা গাছের গোড়াগুলো একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে—আমার রাগ হোল বললুম—এই! গাছে কেন হাত দিয়েছ? সে কাজ বন্ধ না করে বল্লে—বারে, শুকিয়ে আকড়িয়ে যাচ্ছিল আমি আরো ভালো করছি কিনা?

বল্লাম—রাখো, ভালো আর করতে হবে না, সরো—সে সরে গেল। আমি গাছগুলো দেখতে দেখতে একবার তার মুখের দিকে চাইলুম। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য্যাস্তের আয়োজন শুরু হয়েছে। ওরি আভা বুঝি মাসুমার মুখে! ভারি ভালো লাগল—একটু কোমল স্বরে বল্লুম,—রাগ করেছ মাসুমা? তার মাটীভরা হাত দিয়ে সামনের ছোট ছোট চুলগুলি পিছনে সরিয়ে দিতে দিতে বললে,—না, রাগত আমি করিনি। আমরা আজ চলে যাব কিনা? আমিও চলে যাব, গাছগুলোও মরবে—পানি দেবেন না কিছু না। আমিত কালও পানি দিয়েছি—নয়ত কেমন করে গাছ থাকত দেখতাম—বলেই সে হাসলে। আমি





বললুম, আজ যাবে, কখন? "রাত্রের গাড়ীতে যাব বেশ হবে, রাত্রে গাড়ীতে আলো জলবে পাখা চলবে বেশ হবে—"

আমি উঠে এসে তার হাত ধরে বললুম, আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে না? অকুণ্ঠিতভাবে সে ঘাড় নেড়ে বললে, আপনার জন্য নয়, চাচীর জন্য মন বড় ঘাবড়াবে। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন কিনা? আমি হঠাৎ তার নরম লাল গাল দু'টীতে চুমা দিয়ে বললুম—আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি মাসুমা—সত্যি! 'সত্যি সত্যি'? হাঁ, তুমি গেলে আমি কাঁদব, একটুও ভালো লাগবে না

'আমিও তা হলে আপনাকে ভালোবাসবো।' আমি বললুম, সত্যি? সে বললে হাঁ, আপনি আমাদের ওখানে ছুটীতে যাবেন তাহলে খুব খেলব—আচ্ছা? আমি বললুম আচ্ছা—তবে আমাকে একটা চুমো দাও। সে নরম হাতে আমার গলা জড়িয়ে আমার দুই গালে দুইটী চুম্বন দিলে।—জানো আসমৎ?—শিশুর সে চুম্বনে তখন হয়ত কিছুই ছিল না কিন্তু আমার মনে আজো সে চুম্বনের স্মৃতি মধুর হয়ে আছে! প্রথম কৈশোরের সেই মধুর ক্ষণে একটী বালিকার নির্ম্মল চুম্বন আমার মনে চুম্বনের মাধুর্য্য এঁকে দিলে! আমি তাকে বার বার চুম্বন করলুম সে আমার হাত ধরে পরম সারল্যে সেই চুম্বন ভোগ করে গেল।

তার মন সরল, কিছু মনে করলেনা কিন্তু নিজের কাছে আমি নিজে যেন চুরি করছি বলে মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি নীচে চলে এলুম। আমার পিছনে সেও নেমে এল। খেতে বসে কী জানি কী এক দুঃসহ আনন্দ ও ব্যথার বেগে বার বার কেঁপে উঠছিলুম। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে বেরিয়ে গেলুম মাঠে—সেখানে তোমাদের সঙ্গে মিলে হল্লা যতই করলুম কিন্তু মন আমার যেন কেবলই ঘরের পানে ছুটছিল। কিন্তু তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এসে দেরী করার জন্য বাবার কাছে বকুনি ত খেলামই উপরন্তু মাসুমারাও চলে গেছে! মা একলা বসে সুপারী কাটছিলেন। অপরাধীর মতো তাঁর কাছে গেলুম। তিনি বললেন, একটু আগে এলে না মেয়েটা তোমার জন্য কত দুঃখ করল। বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, আর কিছু বলেনি ত? মা আর কিছু বললেন না, আমিও কোন রকমে খাওয়া সেরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম কিন্তু ঘরময় সেই প্রথম অনুভব করলুম বিরাট শূন্যতা!

কতক্ষণ পরে শুন্‌লুম, হয়ত আমাকে নিদ্রিত ভেবেই মা বাবাকে বল্‌ছেন, মাসুমা মেয়েটী বড় ভালো। ওর সঙ্গে কাসেমের বিয়ে দিয়ে বউ করে রাখতে সাধ যায়। বাবা বল্‌লেন, দুঃ মেয়ে ভালো দেখতে তাই কি?—মাষ্টারী ছাড়া বাপের আছে কি—মাষ্টারী না থাকলে ভিখারী! তার মেয়ে ঘরে আনা—ওকথা মনেও এনো না। মা বললেন, তা হলোই বা! তোমারত ভাইয়ের মেয়ে আর একটাইত ছেলে, যা আছে খেয়ে দেয়ে খোদা রাখলে দুঃখ কিসের? বাবা কঠিন স্বরে বললেন, যা হবার নয় তা নিয়ে বকো না। মা চুপ করলেন।

আমার মন সেই কৈশোরের স্বপ্নভঙ্গে অদ্ভুত আশঙ্কায় ব্যথায় ছেয়ে গেল। আসমৎ……হ্যাঁ তারপর বলি শোন। কত বছর কেটে গেল! মাও মরে গেলেন—বি এ এম্-এ পাশও করলুম। হয়ত মাসুমাকেও ভুলে গেছলুম কিন্তু শুন্‌লুম ওরও বাপ মরে গেছেন কোন একটী মাষ্টারেরই হাতে সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তেই। বাবা বুঝি কিছু টাকা বিয়ের খরচা বাবদ দিয়ে মস্ত উপকার করলেন ভেবে খুবই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছিলেন। আমার বিলাত যাওয়ার সবই ঠিক ছিল। বাবা অসুখে পড়লেন, আমার বিয়ে দিয়ে তিনি চোখ বুজতে চান। ওরি মধ্যে আমার বিয়ে হল। ধনীর দুহিতা আদরে লালিতা আসেমার সঙ্গে। বিয়ে করে খুবই খুশী না হলেও খুশী যে হলুম সেটা ঠিক। সুন্দরী তরুণী গরবিনী আসেমা আমার কাছে অতুলনীয়া মনে হ'ল।

বাবা মারা গেলেন। সুখেই গেলেন বলতে হবে। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, গৃহে তরুণী পত্নী, বাইরে

মানমর্য্যাদা হাসি খুশী, জীবনের সুখ-তরণী বিনা বাধায় উধাও হয়ে চলেছে।—এমনি সময়ে মাসুমার স্বামী আবু আলী আমার বাড়ীতে একদিন এসে উপস্থিত। শুনলুম ওর বাবার ঋণের দায়ে মরবার আগে পর্য্যন্ত আমার বাবা ওকে ভিটা ছাড়া করে গেছেন। সেটা ও ফিরিয়ে চায় না কিন্তু মাসুমার বাবার কিছু সম্পত্তি আমাদের মধ্যে আছে সেটুকু চায় আলাদা করে নিতে।

বল্‌লুম—আমি ত ঠিক জানি না, তবে নায়েব ম্যানেজারের সঙ্গে হিসাব কিতাবে বেরুলে নিশ্চয় দিয়ে দেবো।—জোর প্রতিশ্রুতি দিলাম। শুধালাম কী করা হয়? বললে মাষ্টারী—তবে গ্রামে আর নয় কলকাতায় কাজ পেয়েছে বল্‌লুম—পরম আগ্রহেই বল্‌লুম, মাসুমাকে নিয়ে এসেছ? ও বললে হ্যাঁ, আমারও একটি ছোট ভাই ছাড়া কেউ নেই ভাইটা পড়ে স্কুলে, আমরা কলকাতা এসেছি পনর ষোল দিন হবে। ইণ্টালীর ওদিকে আছি। পরম উৎসাহে বল্‌লুম···এত-দিনে একবার খবর দেবার কথা মনে হল না, চলো এখুনি যাব তোমার বাড়ী। লজ্জিত হয়ে আলী বল্‌লে 'নতুন এসেছি ভালোমতো গোছগাছ করে আপনাদের নিয়ে যাবার কথা বলছিল···' বাধা দিয়ে বল্লুম—হাঁ মাসুমা গিন্নি হয়েছে কিনা? আচ্ছা, দেখি ওর দাওয়াতের আগেই গিয়ে পড়লে ও কি করে।

এগারটা বেজেছিল। গাড়ীতে উঠে চল্লুম ওদের ওখানে। গাড়ীতে বসে আলীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল—কেমন লাজুক নম্র ছেলেটা! বেশ লাগল। বাড়ীর গলিতে নেমে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই মিষ্টকণ্ঠে উত্তর হল—নাম না বল্লে দুয়ার খুলছি না·····আলী যেন একটু রেগে উঠল, আমি জোরে কড়াটা নেড়ে দিলুম···আলী বল্লে, আমি আলী, দুয়ার খোলো। দুয়ারটা একপেশে হয়ে খুলল। আমিই আগে ভিতরে গেলুম, আলী পিছনে। মাসুমা—এই সেই মাসুমা! আধাশাড়ী ভিজা। হয়ত ঘর ধুচ্ছিল, মুখের উপর শ্রমকাতর লালিমা—পা দুটী খালি, তবু কি সুন্দর! আমাকে দেখে একটু চমকে কাপড় টেনে দুয়ারের আড়ালে দাঁড়ালে, আমি ও সামলে নিয়ে বল্লুম আমাকে চিনলে না মাসুমা? আমি কাসেম! সে হেসে আমাকে সালাম করলে। বল্লুম, থাক থাক আর সালামে কাজ নেই। কত দিন এসেছ, গিয়ে সালাম করেছিলে?

আলী বেচারা তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে বারান্দায় এনে আমাকে বসতে অনুরোধ করলে। মাসুমা আবার হেসে বল্লে—'বড়লোকের বাড়ী যেতে·····' আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম···ভয় লাগে বুঝি? সে বল্‌লে, ইস্ ভয় আমি কাউকেও করি না, তবে বড়লোকের বাড়ী গেলে এতদিন পর দেখে যদি কেউ চিনতে না পারে সেই ভেবে যাই নি। তবে আপনাকে যখন এখানে বসে দেখলাম তখন বেগম সাহেবাকে দেখতে যাব ভাবছি। তা দেখুন না, উনি বলেন গয়না নেই ভালো কাপড় নেই কী পরে যাবে···আচ্ছা বলুন ত? আমার যদি আপন হয় তবে আমি ছেঁড়া কাপড়ে গেলেও আমার আদর হবে না?

আমি হেসে আলীর দিকে চেয়ে কিছু বলতে চাইলুম—বেচারা আলী! ওকে মাসুমা যে রকম চালায় তা বুঝলুম—এই স্পষ্টবাদিতার লজ্জার সঙ্গে ওর মুখে যে অপূর্ব্ব ভাব ফুটে উঠল তার কথা আজো আমার মনে আছে. কী সুখী এরা দুটীতে! সেই সময় মনে পড়ল ঐশ্বর্য্যে আদরে সুখের খাতিরে তৃপ্তিই বা কি···আর এদের বিত্তহীন চিত্তের ঐশ্বর্য্যের কী ঔজ্জ্বল্য! আমার মনে হ'ল এই সামান্য মাষ্টারের কাছে আমার মতো ধনবানও হার মানতে বাধ্য। এই সুখ সৌভাগ্য আমার নেই। আমি মনের চিন্তাকে চাপা দিয়ে তাদের আনন্দে ডুবে গেলুম। চিরপরিচিত জনের মত মাসুমা কথাবার্ত্তা কইতে লাগল। এ কথা সে কথায় সব খবর জেনে নিয়ে বললে···যখন এসেছেন তখন না, খেয়ে যেতে পারবেন না, তবে একটু দেরী হবে, আমার নাওয়াটা বাকী আছে—আপনি বসুন, আগে একটু সরবৎ দিয়ে মিঠা মুখ করিয়ে নি—

ওর ধরণ-ধারণ কথাবার্ত্তা আমায় অসীম আনন্দ দিচ্ছিল। কী যে বলব ওর অফুরন্ত





কথার সামনে ভেবে পেলুম না, তবুও বল্লুম দুপুর বেলা আমি কি খেতে এসেছি নাকি—আর একদিন এসে খাব।

ঘরের ভিতরে সরবৎ তৈরী করতে করতে মাসুমা বলে উঠল—একদিন নয়ত ভাবী আপনার জন্য দেরী করে খাবেন তাতে আর কি হবে? আমি যে কতদিন অমনি থাকি—জিজ্ঞেস করুন না, ওইত বসে আছেন। আজ এ বন্ধু কাল ও বন্ধুর ওখানে হামেশাই খাওয়া জোটে। আর আমি থাকতুম ঘরে উপোস—এখন দেখি কলকাতায় কার কটা বন্ধু জোটে!

এবারে আলীর মুখ ফুটল। বল্লে···দেখুন না এসেই গণ্ডা ভরে বন্ধু জুটিয়েছে, তা ভালোই, বদলা শোধ হোক, আর খোঁটা শুনতে পারি না। মাসুমা দুই গ্লাস সরবত দিয়ে গেল। আমি ও আলী খেতে খেতে নানা কথা বল্‌লুম—ওদের ঘর কন্নার কথা, গ্রাম কেন ছাড়ল, কী করে চলছে—আলী একটু ইতঃস্তত করে বল্লে··বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলুম বাবা মারা যাওয়ায় আর পড়া হ'ল না। পাবনায় যা কিছু ছিল দেনার দায়ে আপনার বাবার কাছে সবই চলে গেছে। ওর (মাসুমার) বাপের বাড়ী আছে বটে কিন্তু আপনি ত ওখানে নেই, নায়েব ম্যানে-জারের সঙ্গে একটা কথা নিয়ে রাগারাগি হওয়ায় ওর ইচ্ছায় চেষ্টা করে কলকাতা এলুম। কিছু নগদ টাকা ছিল—একটা কারবারের শেয়ার নিলুম, দেখি কতদূর হয়।

আলীর নানা কথার পর বুঝলুম ওরা সামান্য অবস্থায়ই আছে তবুও সুখের সীমা নেই। আরো জানতে পারলুম মাসুমা অন্তঃস্বত্বা একজন চাকরাণী ও এবার রাখবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

"গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন—
স্বপন এমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে, যাক্ নিবে আলোয়ার আলো
গৃহে এস ফিরে ঘুর' না পাকে।"

—কামিনী রায়

---

# সোণার বরণ আশ্বিনে

—শ্রীসুষমা দেবী

—মাগো বল, মোরে বল,—
সোণার বরণ আশ্বিনে তোর মন কেন চঞ্চল ?
ধানের শীষের শিশির যখন টুপটাপ পড়ে ঝরে
সব কাজ ফেলে জানালার পানে কি দেখিস চুপ করে ?
শ্যাম সায়েরের লাখ লাখ ফোটা পদ্মফুলের গায়
কত চিঠি লেখা আছে মা, পড়িতে সারাদিনটাই যায় !
চাঁপার গাছের গায়ে জড়ায়েছে অপরাজিতার দল
তাই দেখে তোর চোখ বেয়ে মাগো কেন ঝরে এত জল ?
হাওয়ায় হাওয়ায় বনতুলসীর গন্ধটি বয়ে যায়
ওমনি মা তুই কি যেন ভাবিস এককোণে নিরালায়—
সন্ধ্যা যখন দীপের আলোয় রাঙায় আঙণ তল,
মুখেতে আমার চুমা দিস আর চোখ করে ছল্‌ছল্‌ !
রাত হয়ে গেলে ঘুমাই যখন মা তোর বুকের পর
ঘুমের ঘোরেই বুঝি আমি তোর বুক কাঁপে থরথর্‌।
সারারাত জেগে কাটাস কেন মা, ঘুম কি আসে না তোর ?
আমার তো ঘুম বেশী হয়ে গেছে, একঘুমে হয় ভোর।
এখনো বাবার চিঠি আসে নাই—তাই বুঝি ভাবনায়
ঘুম আসেনাকো ?—ভাবিসনে, চিঠি নাই যদি পাওয়া যায়—
বাবাতো আমায় বলে গেছে মাগো পূজায় আসিবে ঘর
আঁচলে কেন মা ঢাকিস মু'-খানি বুক কাঁপে থরথর্‌ ?
কেন মা, কেন মা, বাবার কথায় কেন তুই চঞ্চল—
চুপ করে কেন ?—মা-মণি, মা, ওমা !
বল. পায়ে পড়ি, বল !

——



# সমস্যা

—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আমাদের সাক্ষাতে আজকের দিনে যে সমস্যা আসিয়াছে এ শুধু রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ নয়, এ সংঘর্ষ তারও চেয়ে অনেক বেশী, অনেক বড় এবং অনেকদূর প্রসারী। এ সংঘর্ষ জগতের একটী সর্ব্বপুরাতন সভ্যতার সহিত বহুতর আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষ-বিপ্লব। ভারতীয় হিন্দুর বহু সহস্রাব্দীর তপস্যায় লব্ধ এবং বহুতর চেষ্টাযত্নে সহস্রাব্দী কাল ধরিয়া সুরক্ষিত এই অতি পুরাতন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে, ইহার তুলনায় প্রায় শিশু-সভ্যতা বলা চলে এমন একটা নব্য-তন্ত্রতা, আজ বিনষ্ট বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা অপাতঃ মনোরম ঐ নব নবীনের চাকচিক্যময় নূতন রূপে চোখ ধাঁধিয়া তাহাতেই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আত্মনিমজ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। আমাদের ক্ষণেকের তরেও মনে পড়িতেছে না যে, ধ্বংসের অনলেরও একপ্রকার সর্ব্বনাশা উদ্দাম রূপ আছে। উগ্র মদিরার মত তীব্র নেশা নাকি আর কিছুতেই হয় না, কিন্তু তার পশ্চাতে যে সর্ব্বনাশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা বিচার-সাপেক্ষ। গীতাকার যুক্তি দিয়াছেন :—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যৎতদ্‌গ্রেঽমৃতোপমম্‌।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌॥ (গীতা)

সেই পরিণামে বিষপ্রদ লঘু সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া বহ্নিশিখা-বিমুগ্ধ পতঙ্গবৎ আমরা সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া ছুটিতেছি। যে সভ্যতার তীব্র দাহে ইউরোপীয় দাম্পত্যজীবন ক্রমশঃই ভারাক্রান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, আমেরিকা যার চরমে পৌছিয়াছে, সেই স্বার্থপরতাপূর্ণ কৃত্রিম দাম্পত্যের ছদ্মমূর্ত্তি আমরা আমাদের সমাজ-জীবনে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে উদ্যত হইয়া আজ এমন কি হিন্দু বিবাহের মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করিতে দ্বিধা পর্য্যন্ত না রাখিয়া "নৈতিক" সাহস প্রদর্শন করিতেছি। অথচ এর কতদিনই বা পূর্ব্বে এই হিন্দু সতীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় হাসিমুখে পরকালে সহগামিনী হইবার লোভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আজও আইন কানুনের এত কড়াকড়ির ভিতর দিয়াও এক একজন ইহা যে নিষ্ঠুর আত্মীয়দের স্বার্থ-প্রণোদিত ইতরাচার মাত্র নহে, পরম্ভ গভীর প্রেম ও এক-নিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ তাহা প্রমাণ করার জন্যই যেন এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতেছেন ! জাতির মধ্যে যখন বীরত্ব থাকে, তখন নারীর মধ্যেও ভীরুতা থাকিতে পারে না।

মূলকথা ত্যাগ এবং নিষ্ঠা কোন মতেই ছোট হইতে পারে না। যতই সাড়ম্বরে এবং সাহঙ্কারেই প্রচার করা হোক না কেন ভিতরকার ফাঁকি ঢাকা যায় না। আমি লোভী বা ভোগী বলিয়া জগতের সকলকেই যে সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে, এ বড়ই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার কথা ! যে দেশের যে ব্যবস্থা তাহা সেই দেশেরই অনুকূল। শীতের দেশের লোকের শরীরের উপরকার বাহ্যাবরণের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরাও এই দারুণ গ্রীষ্মে জর্জ্জরিত হইতে হইতে হাটকোট, টাই, প্যাণ্ট এবং মেয়েরা কতকগুলি সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউসের বোঝা চাপাইতেছি, এও যেমন নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তির খেলা, ওঁদের বাহিরের চালচলন অনুকরণ করিয়া নিজের সমাজকে তাচ্ছিল্য করাও তেমতি অদূরদর্শি-তারই ফল মাত্র। ইহার ফল কখনও ভাল হইতে পারে না এবং ইহাই "পরিণামে বিষমিব" হইয়া দাঁড়ায়।

আসল কথা পরানুকরণের দ্বারা মানুষ কোন জাতির ভিতরকার গুণ গ্রহণ করিতে পারে না, উহা একেবারে ভিতরকার প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, মানুষ উপরদিক হইতে তার হাবভাব, সাজপোষাক, খাওয়া-শোয়া ওঠাবসারই অনুকরণ করিয়া লয় ; সেইটুকুই অনুকৃত হওয়া সহজ, কিন্তু তার অন্তঃস্থলের সুগভীর প্রদেশে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে নিয়-

লস কর্ম্মোদ্যম, ঐক্য, সুশৃঙ্খলতা, সমাজতন্ত্রতামর দেশপ্রেমিক মহাপ্রাণতা সেগুলিকে কি অনুকরণ করিবার সাধ্য কাহারও থাকে না আমাদের তা' আছে? তা' করিতে গেলে সাধনা করিতে হয়। আর সেই সব কৃচ্ছ্রসাধা সাধনাই যদি করিব, তবে তার চেয়েও বড় আদর্শ যাহা আমাদের পুরাতন সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, যে উচ্চ সভ্যতার কঙ্কাল আজও মধ্যে মধ্যে একটুখানি দেখা যায়, যে আদর্শ কিছুকিছু অনুসরণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী আজ জগতের শ্রেষ্ঠ মানবরূপে সমস্ত জগতেই স্বীকৃত—তাহা হারাইবই বা কেন? "সর্ব্ব-দোষাকরালস্য সর্ব্বপাপ বিবর্দ্ধক" এই শ্লোকটী আমাদের জীবনে প্রতিদিনই যেন প্রত্যক্ষতর হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর আমরা প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের জীবন যাত্রার যেখানে যেখানে আলস্যজনক ব্যবস্থা পাই, সেইটুকুকেই সযত্নে গ্রহণ করি এবং পরিশ্রমসাধ্য সমস্ত অংশটিকেই পরিহার করিয়া চলি একথা অস্বীকার করা চলে না। আমাদের রোগ ধরিয়াছে এইখানেই। আর সেই রোগেরই পরিণামে জাত হইয়া উঠিতেছে প্রচণ্ড স্বার্থপরতা। ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে,—

"Englishman's home is his own castle"

ইংরাজের গৃহ তার নিজের সুরক্ষিত দুর্গ—অর্থাৎ অন্যের তাহাতে কোন অধিকার নাই।

আমরা এই বাক্যটিকে এক মহাবাক্য স্বরূপেই গ্রহণ করিয়া লইতেছি। দুষ্ট আত্মীয় এবং দরিদ্র অভ্যাগত এই সুরক্ষিত দুর্গে আর প্রবেশপথ পায় না! এই হেতু আমাদের দরিদ্র দেশে অত্যন্তই ক্ষতির দিন আসিয়াছে। ধনীর ধন এখন আর দরিদ্রভরণের জন্য নহে, পরন্তু আত্মবিলাসিতায় একান্তরূপেই নিয়োজিত। কুমারীর মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য-পূত পবিত্রাচার নাই, বিধবার সংযম নাই; কাজেই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আজ একান্তভাবেই আকাশকুসুম মনে হইতেছে। কুমারী জীবনে যে সংযম এবং ত্যাগের বীজ প্রথম হইতেই বপন করা হইত, সধবার মিতাচারে যাহা বর্দ্ধিত হইয়া চলিত, দৈবক্রমে যখন বৈধব্য ঘটিত তখনই তাহা স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিত। আজ এদেশে ত্যাগের অর্থ অত্যাচার! ত্যাগীর বিশেষণ নির্ব্বোধ! ভারতের হিন্দু মুসলমান আজ ত্যাগের শান্তি পরিহারপূর্ব্বক, হৃদয়ে হৃদয়ে ভোগের ইন্ধন জ্বালাইয়া তুলিয়া অশান্তির তীব্রদাহে জ্বলিয়া মরিতেছে। তাহাদের মন নিয়ত বলিতেছে;—

আশার সীমানা কিছু নাই, যত পাই আরও তত চাই,—
আরও যদি কর দান, দয়াময় ভগবান! আবারও
চাহিব তবু তাই—"

সেই' আরও' পাইলে' আবারও' আরও পাওয়ার প্রয়োজন ঘটে। সর্ব্বনাশ যে ঘটিয়াছে ঐখানে! বস্তুতান্ত্রিক ব্যবসাদার আমাদের মনকে লোভী করিয়া তুলিয়া তার পণ্য বিক্রয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিয়া তুলিতে নিয়তই সজাগ। আর নির্ব্বোধ আমরা পরানুকরণের তীব্র সুরাপানে কাণ্ডাণ্ডাজ্ঞান হারাইয়া পরের দেশের ঝুটামতি কাঁচ পাথরে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া "সুসভ্য" এবং "সুসভ্যা" হইয়া উঠিতেছি। অবশ্য তারজন্য আমাদের স্বদেশী চার্ব্বাকের চিরন্তন মতটীকেও আমরা গ্রহণ করি নাই তা'ও বলিবার উপায় নাই! এখানে আমরা খাঁটী স্বদেশী। অর্থাৎ কিনা,—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতেষু দেহেষু পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ?—"

এই নীতিটীকে একটুখানি নাম বদল করিয়া লইয়া আমরা অনুকরণ করিতেছি। ঋণ না করিলে' গরীবের খোঁড়া রোগ মিটিবে কেমন করিয়া?

দেহ ভস্মীভূত হইলে চার্ব্বাকের মতে আর পুনরাবর্ত্তন নাই, এখনকার নূতন চার্ব্বাক মতও প্রায় তাইই, আর আসলে সেইখানেই আমাদের সমস্ত সমস্যা গিয়া পৌছিয়াছে। মানুষ যদি ইহলোক-মাত্র-সার দেহাত্ম-বোধী হয় তবে তার দ্বারা কি না ঘটিতে পারে? পরকালের ভয়ই একমাত্র তাকে সহস্র অন্যায় হইতে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তদ্ভিন্ন কঠোরতম রাজনীতি এবং আইন শৃঙ্খলার লৌহ-শৃঙ্খল বা অভিভাবকের রক্তচক্ষু কেহই তাহাকে সংযত রাখিতে পারে না, তা লইয়া যতই কেন চীৎকার করিতে থাকা হৌক। ভারতের ধর্ম্ম ও নীতি একমাত্র ভারতবাসীর রক্ষক। সেইটুকুই যে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে ইহাই তাদের জীবনের প্রধানতম সমস্যা। আরও একটী প্রধান কথা এই যে ভারতবর্ষের নরনারীর





মধ্যের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এদেশের নারীর সতীত্ব। অবশ্য সকল দেশেরই সুসভ্য জাতিসকলের মধ্যে নারীর সতীত্ব এবং নরের সততার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা বা অনাদর নাই, কিন্তু অনাদর না থাকা এক, আর শ্বাস-বায়ুর মত স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবায়ুবৎ অবশ্য-গ্রহনীয়-ভাবে তাহাকে পালন করা সতত কথা। ইউরোপ ভারত-সমাজের তুলনায় শিশু-সমাজ। উহার ভাঙ্গাগড়ার কাল এখনও বহুকাল ধরিয়াই চলিবে মনে হয়। যদি তাকে শিশু বলিয়া স্বীকার নাও করা হয়, তথাপি বলিতে হইবে, বড় জোর ইউরোপীয় সমাজ-শিশুর এখন এই সবে মাত্র নবোদ্ভিন্ন কৈশোর বা যৌবন কাল দেখা দিয়াছে, দৃপ্ত যৌবনের সহজ চপলতা ও উদ্দীপ্ত বাসনাময় আবেগে এখনও তার সমস্ত শরীর মন উদ্দাম হইয়া আছে, কূল-বিপ্লাবী ভরা নদী অনবরতই তট ভাঙ্গিতেছে, তাকে দেখিয়া আজ এই অপক্ষীয়-মান বৃদ্ধ সমাজ যদি তাহাকে অনুসরণ করিতে যায়,তাহা হইলে সে শুধু হাস্যরসের স্রষ্টা হইয়াই নিবৃত্ত হইবে না, নিজেও প্রাণে মরিবে। যে-যৌবনকে বহুদিন পূর্ব্বে সে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টায় তার জীবনের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই বরং সুদীর্ঘ কালের কঠোর সাধনায় লব্ধ সমুদয় তপঃ ফলটাকেই দুষ্ট সরস্বতীর দ্বারা অভিভূত-বুদ্ধি কুম্ভকর্ণের মতই একেবারে ব্যর্থ নিরর্থক করিয়া দেওয়া হইবে। তাছাড়া বৃদ্ধ ইচ্ছা করিলেই যুবক হইতে পারে না, মহামহারসায়ন শাস্ত্রও তাহাকে তার অতীত যৌবনে ফিরাইয়া আনিতে প্রকৃতভাবে সমর্থ হয় না। বৃদ্ধ অভিনেতার দ্বারা তারুণ্যের অভিনয়ে সাফল্যলাভ অল্পই হয়।

তা নয়, ওদিক দিয়া দেখিবার দরকার নাই, ভারত নারীর কর্ত্তব্য তার নিজেদের ঘরেই খুঁজিলে মিলিবে, তারজন্য তাদের কোন যুগ যুগান্তরেও পরের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে না। অতীত যুগেও যেমন, এই বর্ত্তমান যুগেও তেমনি ভারত নারীর কর্ত্তব্য তাঁর স্বদেশের ও স্বীয় সমাজের ধর্ম্ম সদাচার (অর্থাৎ ত্যাগ সংযম ক্ষমা তিতিক্ষা ও সতীধর্ম্ম) ও নিয়মনিষ্ঠার সংলগ্ন হইয়া থাকা। ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ণভাবেই বিহিত আছে বলিয়া এদেশের নরনারী মাত্রেই বিদ্যাশিক্ষার এবং জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার সমান অংশেই গ্রহণ করিবেন। শুধু সাহেব মেমেরা অর্থাৎ ইউরোপের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া থাকেন বলিয়াই নয়। এদেশের মেয়েরা কোন দিনই আকাট মূর্খ ছিলেন না তার প্রমাণ আমাদের প্রণিতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীতেও পাইয়া থাকি।

তার পূর্ব্বের কথাও সুবিদিত। জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, শিল্প সাধনা যা কিছু শিক্ষার অঙ্গ এবং শিক্ষাসাধনার ফল সকলই তাঁদের মধ্যে প্রচুররূপে বর্ত্তমান ছিল। এদেশের মেয়েরা সকল যুগেই এমন কি ঘোরতর জাতীয় অধীনতার দিনেও আত্মসম্মান কুল-গৌরব রক্ষা-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয় নাই। অহল্যাবাই, রাণীভবানী, ঝান্সির রাণী—এঁদের কাছে কোন দেশের কোন মেয়ের সাধ্য আছে যে দাঁড়াইতে পারে? কূট রাজতন্ত্রেও অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণীভবানীর দূরদৃষ্টি বড় বড় রাজনীতিবেত্তার অপেক্ষাও যে অধিকতর ছিল তাহা বাংলার ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন। সত্য কথা যদি বলিতে হয়, তবে বলিব এখনকার এই বর্ত্তমান যুগই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধ তামস যুগ বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট' এই কথাটী এই যুগের পক্ষেই একেবারে সম্পূর্ণরূপেই খাটে। ভারতের শিক্ষাসাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদের ছেলে মেয়েরা কি শিখিতে কার সহায়তা লাভ করিতেছে? পল্লীবাসিগণ তাদের শিক্ষক এবং রক্ষকরূপ রাজা এবং জমিদার-স্থানীয়দের সাহায্য হারাইয়াছে।

কথকতা ও গানের সাহায্যে উঁহারাই সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিধান করিয়া অতি নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেও 'অশিক্ষিত' থাকিতে দেন নাই। ভারতের বহু উচ্চাঙ্গের কাব্য, নাট্য, ইতিহাস ধর্ম্মতত্ত্ব নীতিসার—এতৎ সমুদায় এদেশের আধুনিক দিনে যাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অস্পৃশ্য, তাদের মধ্যেও সুপ্রচারিত হইতে বাধে নাই। এদেশে এই বিংশ শতাব্দীর মত দিনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহা করা যায় নাই, কিন্তু তা' করা গেলেও

তাহার সহিত আমাদের সেকালের সেই শিক্ষাব্যবস্থার তুলনাই হয় না। বাস্তবিক এদেশের নৈতিক শিক্ষার মত এমন উচ্চাঙ্গের নীতিশিক্ষা কোন দেশেই কখন বিহিত হইতে পারে নাই। এই শিক্ষার ফলে সমস্ত জাতিটাই কর্ম্মফলে বিশ্বাসী, পরলোকে আস্থাবান, সুবিনীত সত্যবাদী, সরল এবং নির্লোভ হইয়া উঠিয়াছিল। দূর অতীতের বৈদেশিক পরিব্রাজকবর্গও তাঁদের ভ্রমণ পুস্তকে তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, নিকট অতীতেও আমরা তাহা দেখিয়াছি; আজও আছে; তবে দিনে দিনেই সব নষ্ট ভ্রষ্ট একাকার হইয়া যাইতেছে এবং যাইবে। অপর সকল দেশেরই ইতিহাস নানার কলঙ্ক-কাহিনীতে পরিপূর্ণ,এদেশে তাহা কোথায়? তা যে ছিল না, তার জন্য দায়ী কে? এদেশের সংযমশিক্ষা এবং সতীত্বের গৌরব শিক্ষাই কি নহে? পশু-ধর্ম্মের জয়-গান দ্বারা তাহা লভ্য হইতে পারে না।

বাস্তবিকই এ যুগে কতকগুলি ভাল জিনিষ পাওয়া গেলেও তার বিনিময়ে যাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি তাহার সহিত বিনিময়ের তুলনাই হইতে পারে না। আমাদের আজিকার দিনের মত এমন অধীনতা এদেশে কোন দিনই এর পূর্ব্বে আসিতে পারে নাই। এই প্রকৃত অধীনতা প্রকৃষ্টরূপেই দেহ, মন, বুদ্ধি, বিবেক ও বিচারশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। পরানুকরণকে মানুষ যখন স্বাধীনতা আখ্যা দেয় তখনই জানা যায় তার অধঃপতন কোথায় পৌছিয়াছে! আভিজাত্য বলিয়া একটা গর্ব্ব সকল মানব জাতিরই আছে; প্রত্যেক জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য থাকিবে, এগুলি হারাইলে কোন nationই টিকিতে পারে না, বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের পল্লীসমাজ ও তাহার স্বায়ত্বশাসন শেষ হইয়াছে, সে যে কত বড় জিনিষ ছিল, তার ধারণাও আর বড় বেশী নাই। যৌথ-পরিবারের নিয়ম, সংযম, ত্যাগ, আচারনিষ্ঠ-জীবন আজ স্বপ্নবৎ! দেশের কর্ম্মকারগণ আজ অন্নাভাবে নিজ নিজবৃত্তি ছাড়িয়া ছন্নছাড়া, বহুতর অমূল্য শিল্পসম্ভার, যার তুলনা জগতেই মিলে না তা' লুপ্তপ্রায়। আলস্য, অলসিত দারিদ্র্যপূর্ণ স্বতন্ত্রতায় সমুদায় পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা সহস্র সহস্রবীর তপঃফল প্রনষ্ট! এঁরা যে সকল বিচার-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা এঁদের বর্ত্তমান প্রভুদের কণ্ঠস্বরে এবং তাঁদেরই সৃষ্ট—হয়ত কতকটা অজ্ঞতাপ্রসূত, হয়ত খানিকটা উচ্চাঙ্গের রাজনীতি-প্রণোদিত; নিন্দাপঙ্কে নিজেদের যাহা কিছু উচ্চ সভ্যতা-প্রসূত নিয়মাচারকে পঙ্কিল দেখিয়া জগতে দাসজাতীয় মনোভাবের একটী মহোচ্চ নিদর্শন রাখিয়া পরের নর্দ্দামার পচা পাঁক তুলিয়া তিলক ধারণের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন এবং ইহাতেই ধন্য বোধ করিতেছেন।

এ স্বভাব শোধরাইতে হইবে। এইজন্যই গীতাকার পরধর্ম্মকে "ভয়াবহ" বলিয়াছেন। পর, পরের বাহিরের ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারে। সে অনুকরণ করে তাদের দুর্ব্বলতার! ভিতরকার ঐশী শক্তি অদমিত তেজ, সাহস, একাগ্রতা, একতার অনুকরণ করা তার ভাগ্যে ঘটে না। ইহাই আমাদের পক্ষে হইয়াছে সমস্যার কথা।

# রিক্তা

—শ্রীপ্রতিভা সেন বি-এ

উঠানের উপর তিনটা খেজুর গাছ; একটা বড়, তাহাতে খেজুর ফলিয়াছে, আর দুইটা ছোট। সারা উঠানটায় ঘাস গজাইয়াছে। বেড়া কোন কালে ছিল কিনা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। একপাশে মাটির চারখানি দেওয়ালের উপর খড়ের চাল দেওয়া ছোট ঘরখানি। সামনে না আছে একটা কাটা চালা, না আছে একটু রোয়াক। বাহিরের রাস্তা হইতে ঘরের ভাঙা দরজা দুইখান। দরজা খোলা থাকিলে ঘরের ভিতরকার সবকিছু দেখা যায়। তিনটা খেজুর গাছই সদর রাস্তা হইতে ঘরখানাকে পৃথক করিয়াছে।

গ্রামের প্রায় শেষের দিকে ঘরখানি। এদিকে বড় একটা কেউ আসেও না। উঠানের বড় খেজুর গাছটার খেজুরগুলা পাকিলে দুই চারিজন 'দস্যি ছেলে' গাছে উঠিয়া কাঁদিশুদ্ধ কাটিয়া লইয়া যায়। ঐ একদিনই একটু সোরগোল, তারপর সব নিস্তব্ধ। যে সোরগোলটুকু ছেলেরা করিয়া যায় তাহাও শুনিবার লোক কেহ থাকে না। ঘরের মালিক তখন হয়ত ভিন্‌গাঁয়ে ভিক্ষায় গিয়াছে। ফিরিয়া দেখে খেজুরগাছ শূন্য। রাগে ফুলিতে থাকে, কাঁদে আর বলে,—"মুখপোড়া ছেলে,কাঁদিশুদ্ধ নিয়ে গেলি কেন? গাছের ফল গাছে থাকুক, তোরা আয়, এসে পেড়ে খা, আমি তো বারণ কচ্ছি না। তা নয়, একদিনেই গাছশুদ্ধ পরিষ্কার! মর আঁটকুঁড়ির বেটারা।"—এমনি আরও কত রকম গালি। কিন্তু সে সব শুনিবার কেহই নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। তেলের প্রদীপটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ঘরে দিয়াশলাই নাই; নিকটবর্ত্তী পড়শীর বাড়ীও দুই মিনিটের রাস্তা। তাহারই বাড়ীতে প্রদীপটা জ্বালিয়া আনিতে গিয়া খেজুরগাছের কাঁদি চুরি যাওয়ার কথাটা বলিয়া আসে। প্রতিবেশিনী সমবেদনা প্রকাশ করে—আহা, তাইতো, ছেলেগুলো কি দস্যি বাপু। তারা তো রোজ রোজ গিয়ে খেজুর খেলেই পারে; ও বেচারীরও উঠানের শূন্যতাটা একটু ঘোচে।

বিধু আর সেখানে দাঁড়ায় না। দুচোখ ভরিয়া জল আসিয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি পেটের আঁচলে প্রদীপটাকে হাওয়া-আড়াল করিয়া পলাইয়া আসে।

ঘরের কোণে ছোট উনানটিতে আগুন দিয়া ভাত চড়াইয়া দেয়। তাহাতেই দুটা আলু, একটা কচু ও একটুকরা বেগুন ফেলিয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া জাল দিতে থাকে।

কত চিন্তাই আসে মনের মধ্যে! এই ঘর একদিন মানুষের কলরবে কতই না মুখরিত হইত। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ননদ কে কোথায় গেল! এই দুঃসহ নির্জ্জনতা ভোগ করিবার জন্য তাহাকেই বা কেন রাখা হইল? বিধাতার লীলা!

কিন্তু এতখানি নির্জ্জনতায় কি মানুষ বাঁচিতে পারে? যদি বহু-বহু দূর সম্পর্কেরও কেহ থাকিত, বিধু তাহাকে সাদরে গৃহে আনিয়া রাখিত! কেহ কি আছে? বিধু চিন্তা করিতে লাগিল।···

মনে পড়িল, ছেলেবেলার এক সইয়ের বিবাহ হইয়াছিল রামনগরে। তাহার নাকি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। একটাকে যদি বিধুর নিকট থাকিতে দেয়! দিবে নাকি?

তাহার কি আছে? থাকার মধ্যে সে আর এই কুঁড়ে-ঘরখানি। কিই বা ইহার দাম! ইহার জন্য কি কেউ নিজের ছেলে পরের বাড়ী পাঠায়? হাঁ, যদি তাহার বিষয় সম্পত্তি থাকিত, তবে হয়তো পোষ্যপুত্রের মত সইএর ছেলেকে বা আর কাউকে আনিয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু ভগবান যে তাহাকে কোন সুবিধাই দেন নাই!···

ভাত হইয়া গিয়াছে!

একখানা কানা-উঁচু পিতলের থালায় ভাতগুলি ঢালিয়া লইয়া বিধু খাইতে লাগিল। এমনি করিয়াইত দিন চলে—তবে আজ মন এত উতলা হয় কেন? কত বৎসরই তো এমনি নিরালায় কাটিয়া গেল; মন কি এমন করিয়া কোন দিন কাঁদিয়াছে? কাঁদিয়াছে বই কি! তখন হয়ত সে কাঁদন ভিতরেই গুমরাইয়াছিল, আজ সে আঁখির পথে বাহিরে আসিতে চায়। পেটের ছত্রিশ নাড়ী মুচড়াইয়া উঠে!···

খেজুর গাছটায় একটা বক ডানা ঝাপটাইল।

বিধুর মনে হইল ঐ বুঝি তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। আহা, থাক··· মনে পড়িল,—খেজুরগুলি যখন কচি তখন সে কত যত্নে গাছটিকে রক্ষা করিয়াছে। গাছের গোড়ায় দিবার জন্য বন হইতে কাঁটা কাটিয়া আনিয়াছে; হাত পা ছিঁড়িয়া গিয়াছে তবু মনে হইয়াছে বানর উঠিয়া খেজুরগুলি তো নষ্ট করিতে পারিবে না। কেন? কিসের লোভে? পাকিলে ঐ ছেলেরা আসিয়া খেজুর পাড়িবে, ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া মারামারি করিলে বিধু তাহা মিটাইয়া দিবে, কাহারও পিপাসা পাইলে বিধুর কাছে আসিয়া বলিবে,—বিধুমা, একটু জল দাও,—বিধুর মনের গোপন ইচ্ছাটা যেন আজ অকস্মাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। থালা হইতে মুখ ফিরাইয়া বিধু খেজুর-শূন্য গাছটার পানে চাহিয়া রহিল।

ঘুমে চোখদুটা কখন ঢুলিয়া পড়িয়াছিল! স্বপ্ন দেখিয়া বিধু চমকিয়া চাহিল। চাঁদ ডুবিয়া উঠানের উপর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বিধুর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। কতদিন তো সে এই ঘরে একলা কাটাইয়াছে। কত শোকদুঃখপূর্ণ বিপ্লবময়ী রজনী, শ্রাবণের বাদলঝরা কত দুর্য্যোগ-রাত্রি—কোনদিন ত' মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। আজ তাহার যেন কি হইয়াছে। যে বিড়ালটা আসিয়া রোজ তাহার খাবার সময় দৌরাত্ম্য করে সে আজ আসে নাই। বিধুর ইচ্ছা করিতে লাগিল চীৎকার করিয়া বিড়ালটাকে ডাকে।

বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে গাছপালাগুলাকে যেন দৈত্য দানবের মত মনে হইতেছে। বিধু উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ভাঙ্গা কবাটের ফুটা দিয়া তবু বাহিরে দেখা যায়। বিধু আর সেদিকে তাকাইল না। উচ্ছিষ্ট পাত্রেই হাতমুখ ধোওয়া জল ফেলিয়া মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সারাদিনের ক্লান্তিতে অন্যদিন বিধু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। আজ কিন্তু ঘুম আর আসিতে চাহিতেছে না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতেছে এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গ দিতে যদি কেহ একজন থাকিত!

বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল; তখন সবে জীবনের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বিধুর এতটুকু তৃপ্তির জন্য সেই একজনের কতখানি ব্যাকুলতা! কলহ এবং কূজনে কত রাত্রিই না জাগিয়া কাটাইয়া ভোরে উঠিতে না পারিয়া শাশুড়ী ও ননদের তিরস্কার সহ্য করা! সে কী দিনই ছিল। আশা এবং আনন্দের মাঝখানে সেদিন কে ভাবিয়াছিল যে বিধুকে আজ এমনি করিয়া একলা কাটাইতে হইবে? আজিকার এই পক্ককেশা শীর্ণদেহা বিধুকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইহার প্রাণেও একদিন ভালবাসার তুফান উঠিয়াছিল! হায়রে সবই নিয়তি!

* * *

যাহাকে সকলেই ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার মনে মানুষের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা কেন জাগে! জাগিলে তাহার নিবৃত্তির উপায়ই বা কি?

কোন উপায় নাই!···

বিধাতা ওর রিক্ত জীবনকে এখনও কেন যে নিঃশেষ করিয়া দেন নাই!—উহার এই একক নিঃসঙ্গ জীবন দিয়া তাঁহার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা কে বলিবে?

আবার কাল সকাল হইবে, প্রতিদিনকার বৈচিত্র্যবিহীন জীবন এমনি করিয়াই তাকে বহন করিয়া চলিতে হইবে—আরো কতকাল—কে জানে?···

—:—

# মীরার সঙ্গীত

—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

মহাঁনে চাকর রাখো জী।
চাকর রহসূঁ, বাগ লগাসূঁ, নিত উঠি দরশন পাসূঁ॥
বৃন্দাবনকি কুংজ গলিনমে তেরী লীলা গাসূঁ॥
হরে হরে সব বন বনাউ বিচ বিচ রাখুঁ বারী।
সাঁবলিয়াকে দরশন পাউঁ, পহির কুসুম্মী সারী॥
জোগী আয়া জোগ করনকুঁ, তপ করণে সন্ন্যাসী।
হরি ভজনকুঁ সাধু আয়ে বৃন্দাবনকে বাসী॥
মীরাকে প্রভু গহির গঁভীরা হৃদয়ে রহো জী ধীরা।
আধীরাত প্রভু দরশন দৈহেঁ প্রেমনদীকে তীরা॥

( অনুবাদ )

আমায়, সেবক করিয়া রাখগো।
এই, দেহে মনে প্রাণে মোর সবখানে তুমি প্রভু হয়ে থাক গো॥
আমি, তব প্রীতি তরে যতনে স্বকরে রচিব কুসুমবীথি।
আহা, প্রভাতে উঠিয়া চরণে লুটিয়া দরশন পাব নিতি॥
আমি, বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে জুড়াইব প্রাণ।
সেথা, পথে পথে যাব, প্রাণ খুলে গা'ব প্রভু তব লীলাগান॥
আমি, সবুজ-সবুজ বন উপবন রচিব তোমারি তরে।
তার, ধারে ধারে দিব জলভরা ঝিল,—ফুলের কেয়ারী করে'॥
ওগো, বনের শ্যামল রূপ মাঝে মোর শ্যামেরে খুঁজিয়া পাব।
আমি, কুসুমী রংয়ের শাড়ীতে সাজিয়া প্রেমভরে সেথা যাব॥
হেথা, যোগী আসিয়াছে যোগেরি লাগিয়া তপ লাগি সন্ন্যাসী।
হের, হরি ভজিবারে যত সাধুগণ ঐ বৃন্দাবন বাসী॥
ওগো, মীরার সাথে যে সুগভীরতর প্রেমবন্ধন তাঁর।
মোর, অধীর হৃদয় শান্ত হওরে! থির হও এইবার॥
ঘন, নিশীথ রাতের নিবিড় আঁধারে আসিবেন প্রভু ধীরে।
ওরে, দর্শন তাঁর মিলিবে মিলিবে প্রেম যমুনারি তীরে॥

# পরলোকে মিসেস্ এনি বেশান্ত

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ডাঃ এনি বেশান্ত অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ আদিয়ার আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি একটী কথাও বলেন নাই কিম্বা তাঁহার দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই। সেই সময় তিনি ঘুমাইতেছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা এনি বেশান্ত ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উইলিয়ম পেজউড সাহেবের কন্যা। বর্ত্তমান সনের ১লা অক্টোবর তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হইত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত সাহেবের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর শ্রীযুক্তা বেশান্ত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আদালতের সাহায্যে উক্ত বিবাহ-সূত্র ছিন্ন করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিখ্যাত ব্রাড্‌ল সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া নাস্তিকতা ও সাধারণতান্ত্রিকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি রচিত সিক্রেট ডকট্রিণ (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থখানির একটি সমালোচনা ষ্টেড (Stead) সাহেব তাঁহার "রিভিউ অব রিভিউস" পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য এনি বেশান্তকে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে বেশান্তের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার নাস্তিকতা যাইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল। তিনি গ্রন্থকর্ত্রীর শিষ্যা হইলেন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে সমস্ত মন ও প্রাণ উৎসর্গ করেন।

১৯০৭ সালে কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর পর তিনি থিওসোফিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন এবং তৎপরে আরও তিনবার উক্ত পদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্তা বেশান্ত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'কমনউইল' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েক মাস পরে তিনি 'মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক দৈনিক পত্রিকা ক্রয় করেন এবং পরে উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'নিউ ইণ্ডিয়া' এই নামকরণ করেন।

বিগত মহাসমর আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই ডাঃ বেশান্ত অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বহিষ্কারের আদেশ দেন এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১৯১৭ সালে তাঁহাকে অন্তরীণ করেন। মুক্তির পর তিনি ১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার কিছু পরেই তিনি একটী আন্দোলন আরম্ভ করেন, ফলে ১৯২৫ সালে ভারতের জন্য পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জানাইয়া ন্যাশনাল কনভেনশন এবং কমন ওয়েল্‌থ্ অব ইণ্ডিয়া বিল নামক একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। বৃটিশ শ্রমিকদল উক্ত বিলটি সরকারীভাবে গ্রহণ করেন এবং উক্ত দলের জনৈক সদস্য উক্ত বিলটি পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। উহা প্রথম বার পঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বার পঠিত না হওয়ায় উহা বাতিল হইয়া যায়। তৎপরে তিনি জনসেবা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনুমান দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি থিওসোফিক্যাল কনভেনশনে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উহাই তাঁহার জনসেবার শেষ বক্তৃতা।



# খেলা ধূলায় নারী

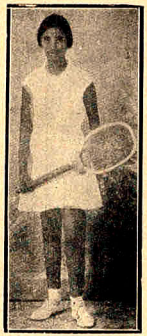

কুমারী দোবাস
১৩ বৎসরের মেয়ে করাচী শহরে অধিষ্ঠিত টেনিস খেলার প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাস্ত করিয়া দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন

কুমারী তমাকো কোয়াসী
'টেনিস' বিজয়িনী জাপানী মহিলা

কুমারী সাবিত্রী দেবী
জার্ম্মাণীর সেণ্ট্রাল গার্ল হাই স্কুলের ছাত্রী। সাঁতার প্রতিযোগিতায় গঙ্গা পার হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন

মু ক্রীড়
বিমানচারিণী মি. পাশা
ম্যাগোর এই ১৮শ বর্ষীয়া হই
বৈমানিকদের রিয়া

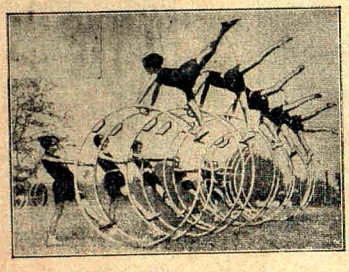

গোল-চাক্কি
এই অদ্ভুত গোল-চাক্কি খেলা ইউরোপের বিশেষতঃ
জার্ম্মাণ মেয়েদের অতি প্রিয় সামগ্রী

মিড্‌ল সেক্‌স্‌ মহিলা-ক্রীড়া-
প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী

, আর্ম্মষ্ট্রেঙ্গ
ধনুর্বিদ্যার জন্য "বিজয়িনী"
রিয়াছেন

ব্রিষ্টলের একটী বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রিগণ তরবারি
চালনা শিক্ষা করিতেছেন। এই স্কুল বালিকা বিদ্যালয়-
গুলিতে ইহা নিয়মিত



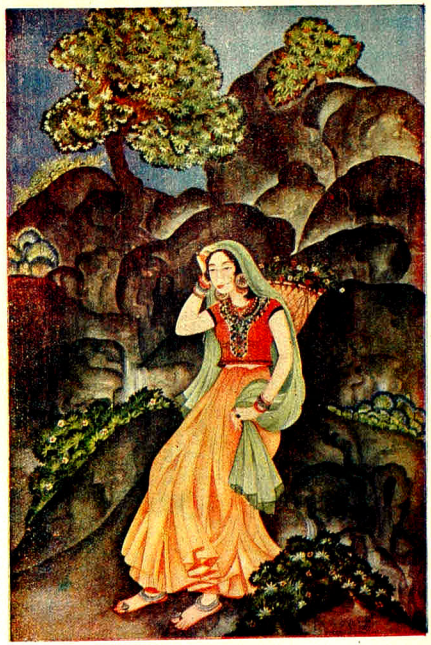

পাহাড়ী ফুল

'বঙ্গলক্ষ্মী'র সৌজন্যে— শিল্পী—শ্রীসবিতা দেবী —সওগাত প্রেস

## এই সংখ্যার লেখিকাগণ

কুমারী আছিয়া মজিদ, বি-এ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

শ্রীঅনুরূপা দেবী

শ্রীপ্রতিভা সেন, বি-এ

শ্রীআশালতা দেবী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শ্রীসুষমা দেবী

শ্রীমতী মলিনা হালদার

মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

কুমারী জাহান-আরা বেগম চৌধুরী

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

শামসুন নাহার ইউসুফ

বসন্তপঞ্চমী—

শিল্পী ( ইউরোপীয় )

শিল্পী—সুরেন্দ্রনাথ কর